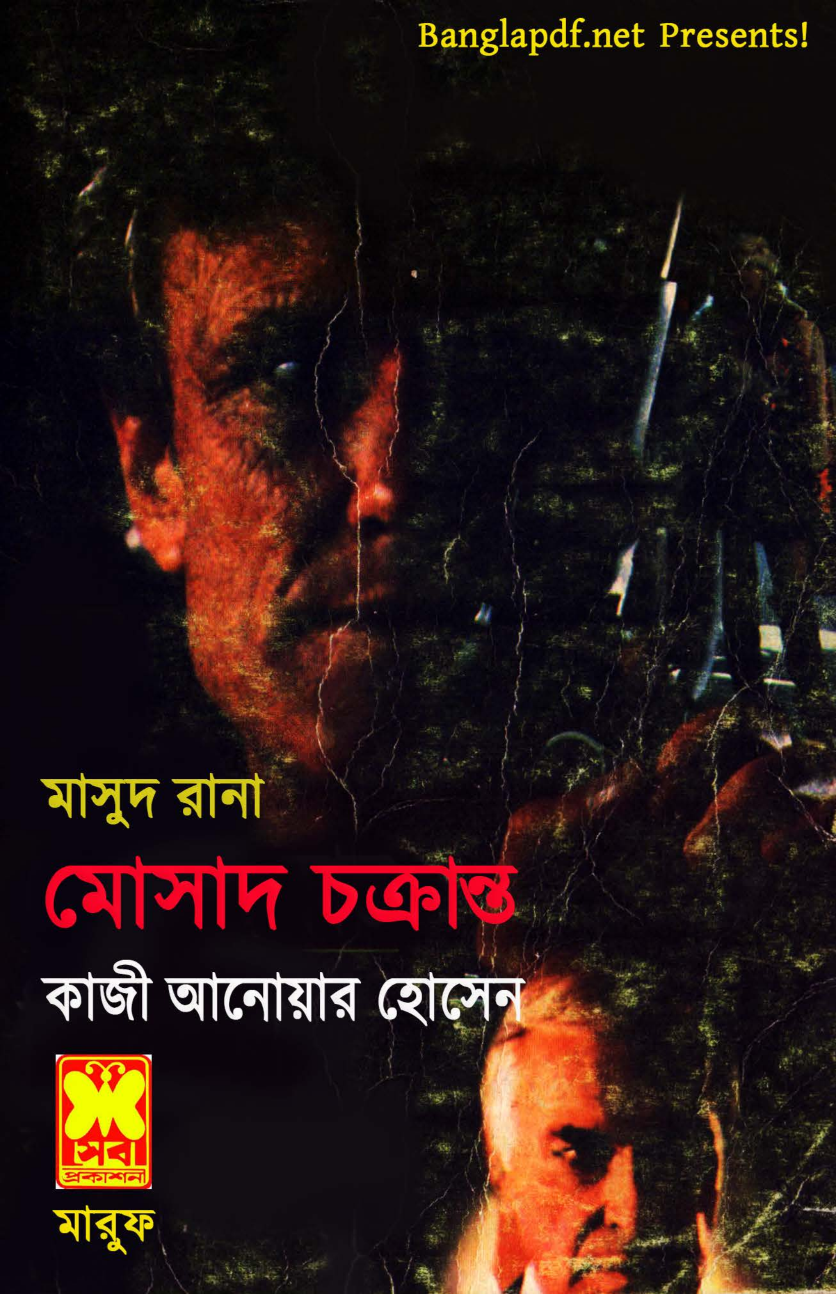


মাসুদ রানা

মোসাদ চক্রান্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মারুফ



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Banglapdf.net
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
স্ক্যানিং
MARUF
এডিটিং
মারুফ
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা

মোসাদ চক্রান্ত

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7649-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৭

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি পি ও বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
MOSAD CHAKRANTO

By: Qazi Anwar Husain

চল্লিশ টাকা

মোসাদ চক্রান্ত ৫-৭৯
বিপদসীমা ৮০-১৮৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৯/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫২/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪১/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৮/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৮/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৪৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৮০/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)'	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-

১৪১-১৪২ মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪ অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮ বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০ শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২ শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫৬-১৫৭ মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২ সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০ আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫ কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪ মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭ চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৬৮-১৬৯ অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১ যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩ জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫ কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭ কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৫৪/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিপব্যাণ্ড+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৪৭/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৫৮/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৫/-

মোসাদ চক্রান্ত

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

এক

ঘুরে দাঁড়াল রানা দৌড়ে আসছে সোহানা ওর দিকে। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে. আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে দু'চোখ দৌড়াতে দৌড়াতে একবার পেছনে তাকাল।

আসছে! এসে পড়েছে শিকদার! ধরে ফেলবে এক্ষুণি!

'রানা, বাঁচাও!'

সোহানার গ্রীবা আঁকড়ে ধরতে থাবা বাড়াল শিকদার।

বাঁচাতে হবে সোহানাকে, কিছুতেই পিশাচসাধকের হাতে ওকে পড়তে দেয়া চলবে না। পা বাড়িয়ে অনুভব করল রানা, ভয়ে বুক ধড়ফড় করছে ওর, ঘামে ভিজে গেছে সারাশরীর। রোমকূপে শিরশিরে একটা অনুভূতি

নক্ষত্রের আলোয় দেখা যাচ্ছে শিকদারকে, মৃদু বাতাসে বাদুড়ের ডানার মত উড়ছে তার কুচকুচে কালো সিল্কের আলখেল্লা।

ওয়ালথার পি.পি.কে. ·৩৮ তুলেই ট্রিগার টিপল রানা। ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো। গুলি নেই চেম্বারে। এই তো একটু আগেই ম্যাগাজিন আর চেম্বারে গুলি ভরেছে ও!

তাহলে?

এসে পড়েছে শিকদার। জাপটে ধরল সোহানাকে। হাসছে গলা ছেড়ে দুর্গের মত বাড়িটায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে বিকট প্রতিধ্বনি। বাগানের বাবলা গাছ থেকে ওঁয়া-ওঁয়া শব্দে কেঁদে উঠল একটা শকুন ছানা।

'বাঁচাও, রানা!' আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল সোহানার গলা চিরে।

পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা। এগোতে চাইল। কিন্তু একচুল নড়তে পারল না।

কাদা!

কাদায় পা দেবে গেছে ওর!

বেজে উঠল একটা সাইরেন। দ্রুত এগিয়ে আসছে শব্দটা।

না, সাইরেন নয়; দূরে কোথাও বাজছে টেলিফোন। এই নির্জন বসতিহীন দ্বীপে টেলিফোন?

সোহানা!

কোথায় সোহানা?

শিকদার বা সোহানা, কাউকে দেখা যাচ্ছে না!

কোথায় ওরা?

অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল রানার।

কানের কাছে এসে থেমে গেছে টেলিফোনের শব্দ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে বেজেই চলেছে। ব্যাপার কি! সচেতন ভাবে চিন্তা করতে চাইল রানা। থেমে গেল শব্দটা।

'আব্বা, নটা বাজে। চা খাবেন না?'

ফোঁস করে স্বস্তির শ্বাস ফেলে চোখ মেলল রানা। রাঙার মার গলা। বাসায় আছে ও। হেসে ফেলল ঘুমের মধ্যে বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছে বুঝে। বুড়ি না জাগালে সর্বনাশ হয়ে যেত, পিশাচসাধকের পাল্লায় পড়ে নিজেও পিশাচ হয়ে গিয়েছিল আরেকটু হলে!

'নাস্তা দাও, রাঙার মা, আমি আসছি।'

চটপট বিছানা ছাড়ল রানা। দশমিনিট পর শাওয়ার-শেভ সেরে ডাইনিং রূমে এসে বসল। টেবিল সাজিয়ে দিয়ে গেছে রাঙার মা। রানার সামনে একটা প্লেটে স্তূপ হয়ে আছে পুরু মাখনের আস্তরণ দেয়া টোস্টের বাটালি হিল। একপাশে সকালের সূর্য-রঙা দুটো ডিম পোচ, দু'গ্লাস হরলিক্স দেয়া খাঁটি গরুর দুধ আর রাঙার মার তৈরি স্পেশাল বটি কাবাব।

সব খেতে হবে, নইলে ছাড়বে না রাঙার মা। এমনিতেই অনুযোগের অন্ত নেই, আব্বা আমার শুকিয়ে একেবারে এদানির নেশাখোর হাড়-জিরজিরে ছোঁড়াগুলোর মত হয়ে গেছেন!

গত ক'দিনেই দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে ওর বুড়ির স্নেহভরা অনুরোধ রাখতে গিয়ে। মাত্র চারদিন হলো ক্লান্তিকর মিশন শেষে দেশে ফিরেছে ও, এরইমধ্যে ওজন বেড়ে গেছে দুই পাউন্ড। আজকে প্লেটে দু' স্লাইস পাউরুটি রেখেই সন্তর্পণে টী পটের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, কিন্তু দরজার পর্দাটা নড়ে উঠতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত ফিরিয়ে নিল। পার পাওয়া যাবে না, বুড়ি ঠিক নজর রেখেছে দরজার আড়াল থেকে। খাবার ফেলে উঠতে চাইলেই একগাল ফোকলা হাসি নিয়ে ছুটে আসবে, পটিয়ে ফেলবে ওকে।

বেল্ট ঢিলে করে নিয়ে নতুন উদ্যমে এক স্লাইস পাউরুটিতে কামড় বসাল রানা।

ক্রিং! ক্রিং! টেলিফোন বেজে উঠল আবার।

এইবার অজুহাত পাওয়া গেছে। ফোনের রিসিভার তুলে নিল রানা। অন্যমনস্ক একটা ভঙ্গি করে টোস্ট নামিয়ে টী পট থেকে চা ঢেলে নিল কাপে।

'হ্যালো, কে বলছেন প্লীজ?'

চায়ে দুধ-চিনি মেশানো হয়ে গেছে রানার। হতাশ চেহারায় টেবিল সাফ করতে এগিয়ে এল রাঙার মা।

'তোর দুলাভাই, বলছি।' ওপ্রান্তে সোহেলের গম্ভীর কণ্ঠ। 'ব্যাপার কি শ্বশুরের পুত্র, এত বেলা করে ঘুমাচ্ছিস যে? বিদেশে ঘুরে ঘুরে লাটসাহেব হয়েছ, পায়া ভারী হয়েছে, না? এদিকে আমরা বুড়োর ধমকে...'

'বিদেশে না গিয়ে কি করি বল্, হাজার হলেও বন্ধুর প্রেমিকা!'

'মানে?'

ভ্রূ কুঁচকে চোখ পাকিয়ে থাকা সোহেলের কথা ভেবে মুচকি হাসল রানা। 'মানে দেশে থাকলে তোকে ছেড়ে নীলা মেয়েটা আমার প্রেমে পড়ে যাবে ভেবেই তো স্ক্রীন থেকে ডিলিট হয়ে গেলাম।'

'তবে রে শালা!' হুঙ্কার ছাড়ল সোহেল।

গালাগালের তুফান ছোটানোর আগেই থামিয়ে দিল রানা। 'হ্যাঁরে, বুড়ো খুব চোটপাট করছে বুঝি?'

নরম হলো সোহেল। 'তবে আর বলছি কি, দোস্ত; আয় না, নিজে এসেই একবার দেখে যা। আজ অফিসে পৌঁছুতে দু'মিনিট দেরি হয়েছে, কি ঝাড়াই না ঝাড়ল ইন্টারকমে। সেই তখন থেকে ফোন করছি, তোর বুড়ি কিছুতেই তোকে লাইন দেবে না। শেষে ঘুষ দিয়ে...বলেছি রিং বাজতে দিলে মিরপুরে ন্যাঙটো পাগলের মাজার থেকে তাবিজ আনিয়ে দেব। তবেই বুড়ি রাজি হয়েছে। আয়, দোস্ত, এসে একটু ঠাণ্ডা করে দিয়ে যা বুড়োকে।'

'বুড়ো আমাকে অফিসে যাওয়ার পারমিশন দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'সোহানা কোথায়?'

'হংকং—অ্যাসাইনমেন্টে। তুই আসছিস না, সোহানার খবর নেই—আরে, সেজন্যেই তো বুড়ো দিন-দিন মহাখাপ্পা হয়ে উঠছে। বাঁচা, দোস্ত, হাড় কালি করে ফেলল। তুই দেখা করে গেলে কয়েকদিন ঠাণ্ডা থাকবে। ডাকতে পারছে না কাজ নেই বলে, কিন্তু তুই নিজে এলে মনে মনে খুশি হবে।'

'বেশ, আমি আসছি। এক কার্টন বেনসন অ্যান্ড হেজেস এনে রাখিস।'

'কিসের জন্যে?'

'সেলামী।'

'এক প্যাকেট পাবি।'

মস্ত একটা হাই তুলল রানা। 'শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করছে রে! নাহ্, আজকে ভাবছি আর অফিসে যাব না!'

'দুই প্যাকেট।'

'এক কার্টন।'

'বেশ।' বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'পাবি।'

'ধরে নে আধঘণ্টার মধ্যেই আমার চাঁদমুখটা তোদের অফিসে দেখা যাবে।...নীলাকে কফি রেডি রাখতে বলিস।' ফোন ছেড়ে দিল রানা।

পাঁচমিনিট পর শিস দিতে দিতে গ্যারেজ খুলে উঠে বসল রানা ঝকঝকে নতুন টয়োটা করোলার ড্রাইভিং সীটে। পনেরো মিনিট লাগল ওর বনানী থেকে মতিঝিলে পৌঁছতে। সাততলা অফিস বিল্ডিঙের কাব পার্কে গাড়িটা রেখে লিফটে করে ছয়তলায় উঠে এল ও।

করিডরে কেউ নেই। দু'পাশের দরজাগুলোয় তালা ঝুলছে। সলিল, জাহেদ, আবির, সোহানা, রূপা–সবাই ওরা দেশের বাইরে, অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত। হয়তো এই মুহূর্তে দেশের জন্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওরা!

মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে ওরা: দেশপ্রেম, দুঃসাহস আর বুদ্ধি দিয়ে লোকবলের অভাব, প্রযুক্তির অভাব পুষিয়ে নিচ্ছে। সি.আই.এ, মোসাদ, কেজিবির মত বড় ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসও আজ বি.সি.আইকে অবহেলার চোখে দেখে না।

বিদেশে এত সুনাম, কিন্তু দেশের ভেতরের শত্রুদের ঠেকানো যাচ্ছে না। রাজনীতিকদের ছত্রছায়ায় সারাদেশে আজ চলছে সন্ত্রাসের মহোৎসব। লুটপাট, ছিনতাই, চাঁদাবাজি চারদিকে। গোটা দেশ মাফিয়া চক্রের হাতে জিম্মি। তার ওপর বিরোধী দলের হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধের অত্যাচার। যে আজ সরকারে, সেই তখন বলে হরতাল-জ্বালাও-পোড়াও ইত্যাদিতে দেশের মস্ত ক্ষতি, এসব দরিদ্র জনগণের ওপর অমানবিক নির্যাতনের শামিল। কিন্তু যেই গদিচ্যুত হয়–ওমনি এসব হয়ে যায় প্রতিবাদের ভাষা...

দূর ব্যাটা, এসব ভাবছিস কেন, তোকে কি কেউ ডায়াসে উঠে বোলচাল মারতে ডেকেছে? মুচকি হাসল রানা। নক না করেই ঢুকে পড়ল সোহেলের কামরায়।

টেবিলের ওপরে দু'পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল সোহেল। দরজা খোলার শব্দে পা নামিয়ে নিয়ে হাসল রানার দিকে তাকিয়ে।

'আয়, বোস।'

টেবিলের কোনা ঘুরে সোহেলের পাশে চলে এল রানা, ওপরের ড্রয়ার টান দিয়ে দেখল বন্ধ। তালা মারা।

ওকে দেখেই চাবিটা সোহেল দু'আঙুলে ধরে ঝাঁকি দিয়ে মুঠোয় লুকিয়েছে।

'আছে, আছে, এমন ছোঁক-ছোঁক করছিস কেন, ড্রয়ারে পুরো একটা কার্টন এনে রেখেছি।'

সন্দেহের চোখে সোহেলের নূরানি হাসিমাখা চেহারাটা দেখল রানা। ব্যাটা

এত সহজে টাকা খসানোর পাত্র নয় গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পেল ও। বলল, 'আগে দেখা।'

'আগে বোস। কফির অর্ডার দিচ্ছি, খেয়ে নিয়ে দেখিস।' ইন্টারকমে নীলাকে ডাকল সোহেল। রানার অনুরোধে মেয়েটাকে সোহেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি করা হয়েছে। মেজর জেনারেল জানতে চেয়েছিলেন নীলার আচরণে রানা অসন্তুষ্ট কিনা। রানা বলেছে মেয়েটা খুবই এফিশিয়েন্ট, স্যার, আমার চেয়ে এমন একজন সেক্রেটারির প্রয়োজন সোহেলের বেশি। আপত্তি করেননি রাহাত খান, হাসির সূক্ষ্ম আভাস দেখেছিল ও বুড়োর দু'চোখে। সোহেল আর নীলার প্রেমের খবর চিরকুমার বুড়োর কানে গেছে কিনা কে জানে।

ঘর আলো করে ঢুকল নীলা। নীল জর্জেট আঁটো করে পরেছে। দীর্ঘ চুল চুড়ো করে খোঁপা করা। খোঁপায় গুঁজে নিয়েছে রক্তলাল একটা গোলাপ। কটমট করে পরস্পরের দিকে চেয়ে ছিল রানা আর সোহেল, নীলাকে দেখে দু'জনই বিগলিত মধুর হাসি উপহার দিল।

'নীলা, দু'কাপ কফি প্লীজ,' বলল সোহেল।

'তিন কাপ।' শুধরে দিল রানা।

পাশের কামরায় চলে গেল নীলা ছন্দের হিল্লোল তুলে। কাপ পিরিচের টুংটাং শব্দ হলো।

'মাসুদ ভাই, চিনি কয় চামচ?' দু'মিনিট পর টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রাখল নীলা।

'তোমার হাতের কফি চিনি ছাড়াও মধুর মত।' সোহেলের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল রানা। পোড়া একটা গন্ধ পেল নাকে। টিউবলাইটের চোক পুড়ছে, নাকি সোহেল বাবাজির হৃৎপিণ্ড?

'কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো, নীলা।' ছাই চাপা আগুনটাকে আরও একটু উস্কে দিল রানা।

জবাবে মিষ্টি করে হাসল নীলা।

'আপনি তো অফিসেই আসেন না, মাসুদ ভাই, এলে তবেই না দেখা হওয়ার প্রশ্ন।'

খুব দোষ করেছে এমন চেহারায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় ইন্টারকমে জলদ গম্ভীর গলা ভেসে এল।

'সোহেল, রানা এসেছে? এসে থাকলে পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বী, স্যার।' রানাকে চোখ টিপল সোহেল। ড্রয়ার খুলে বেনসন অ্যান্ড হেজেসের খালি একটা কার্টন রানার সামনে ঠকাস করে টেবিলে ফেলল। ইন্টারকমের সুইচ অফ আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'নে, তোর দাবি

মিটিয়ে দিলাম।'

চোখ পাকাল রানা। 'খালি কেন?'

'কার্টন চেয়েছিস কার্টন পেয়েছিস, এত কথা কিসের? নিচের দোকান থেকে চেয়ে এনেছি, নিয়ে ভাগ এখান থেকে। ভরা থাকবে এমন কোনও কথা ছিল? তাছাড়া...' একগাল হাসল সোহেল। 'তোর সঙ্গে ফোনে কথা হওয়ার দশ মিনিট পরেই ফোন করেছে সোহানা। মিশন সাক্সেসফুল। আজকে বিকেলের ফ্লাইটে আসছে ও।'

মোটা কাগজের কার্টন, দু'হাতে মুচড়ে বড়সড় একটা কাগজের বল বানাল রানা। 'এই দিন দিন নয় আরও দিন আচে,' বলেই ছুঁড়ে মারল সোহেলের পেট সই করে। সোহেল তেড়ে উঠতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ও, পাকা বাস্কেটবল প্লেয়ারের মত সোহেলকে ডজ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল নীলা বয়স্ক দুই শিশুর কাণ্ড দেখে।

'কফি না খেয়েই পালাচ্ছিস যে, পয়সা দিয়ে যা!' পেছন থেকে সোহেলের হাহাকার শুনতে পেল রানা। থামল না। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে ওর বেতালা ছন্দে। সোহেলের ভয়ে নয়, বুড়োর সামনে যেতে হবে, সেজন্যে।

দরজার সামনে পৌঁছে একটু থামল রানা। বড় করে শ্বাস নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। 'এসো, রানা।' সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পেছনে বসে আছেন রাহাত খান। একটু কুঁচকে আছে ভ্রূ। কপালের একটা শিরা কি লাফাচ্ছে?

'বসো।'

আস্তে করে চেয়ারটা একটু পেছনে টেনে বসল রানা, অপেক্ষা করছে।

একটা সিগার ধরালেন রাহাত খান। ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে রানাকে কড়া চোখে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর টেবিলের পাশ থেকে একটা ফাইল তুলে এগিয়ে দিলেন। 'পড়ো।'

ফাইল খুলে চোখ বোলাল রানা। কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম, জাতীয়তা আর ডোশিয়ে আছে ওতে। এঁরা সবাই আরব দেশগুলোতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছিলেন। এঁদের মধ্যে দু'জন বাংলাদেশীও আছেন, বাংলাদেশ আর কুয়েত সরকারের চুক্তি অনুযায়ী কুয়েতে গবেষণা করছিলেন এঁরা নিরাপদ আণবিক শক্তির ব্যবহার বিষয়ে।

চোখ তুলে তাকাল রানা। এখনও ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন মেজর জেনারেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বুঝলে?'

'বিজ্ঞানী এঁরা সবাই। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী।'

'তাই ছিল, রানা। কিন্তু এখন এরা জড় পদার্থ। মুখে তুলে খাইয়ে না দিলে খেতে পারে না। সবাই এরা এক বছরের শিশুর মত হয়ে গেছে।'

চুপ করে আছে রানা, রাহাত খান বক্তব্য শেষ করেননি। উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে নিচে মতিঝিলের ব্যস্ত সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর পেছন না ফিরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'লন্ডনে ফিরছ কবে?'

'আগামী সপ্তাহে, স্যার। এজেন্সিতে কিছু কাজ জমে আছে, ওগুলো শেষ করতে হবে।'

'এক মহিলা বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগাযোগ করেছিল, রানা। লন্ডনে। উচ্চারণ শুনে ধারণা করা হয়েছে ইহুদি মহিলা। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে ইসরায়েলী সরকারের একজন কর্মকর্তা। যোগাযোগ করেই ডুব মেরেছে। তাকে আর লন্ডনে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিসিআইয়ের টপ এজেন্টের' সঙ্গে কথা বলতে চায়। তোমার কথা বলেছে। তুমি লন্ডনে গেলে হিলটন হোটেলে উঠবে। সেখানে যোগাযোগ করবে মহিলা। পাসওয়ার্ড "দুনিয়ার সাহায্য দরকার"।...এটা ইসরায়েলীদের একটা ফাঁদও হতে পারে, রানা। তা-ই যদি হয় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে দেরি করা ঠিক হবে না।'

'কিছু বলেছে, স্যার, কি বিষয়ে কথা বলতে চায়?'

'বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে কিছু তথ্য দেবে বলেছে। ব্যস, আর কিছু না। আমি চাই তুমি কালকের ফ্লাইটে লন্ডন যাও।'

আবার চেয়ারে এসে বসলেন রাহাত খান, রানার দিকে তাকালেন। 'কুয়েতি ইন্টেলিজেন্স কিছু তথ্য জানিয়েছে। ওদের ধারণা একটা বিশেষ সম্মেলনে বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। প্রতি মাসেই দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীরা এই সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলন চলে তিনদিন ব্যাপী। বেছে বেছে মুসলিম বিজ্ঞানীদের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে, রানা। কুয়েতি ইন্টেলিজেন্সের সন্দেহ মোসাদের হাত আছে এর পেছনে।...মহিলাও এই ব্যাপারেই তথ্য দিতে চায় বলে আশা করছি।'

পাশ থেকে একটা ফাইল টেনে নিলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'আর সব খবর ভাল তো?' অর্থাৎ বিদায় হও এবার। ঘাড়টা কাত করল রানা। আস্তে করে উঠে দাঁড়াল, নিঃশব্দে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

দুই

রাত এগারোটা। হোটেল হিলটন। লন্ডন।

সোফায় বসে আছে রানা, বিরক্ত বোধ করছে। দু'দিন ধরেই অপেক্ষা করছে ও। একবার শুধু দূতাবাসে জানিয়েছে মহিলা, রাত দুটোর সময় হিলটনে যোগাযোগ করবে সে। ইতিমধ্যেই একটা রাত পেরিয়ে গেছে, মহিলা ফোন করেনি।

ক্রিং! ক্রিং!

ফোন বেজে উঠল রিসিভারটা কানে ঠেকাল রানা। ওপ্রান্তে মেয়ে কণ্ঠ।

'মিস্টার রানা? লবিতে একটু আসবেন? পরিকল্পনায় সামান্য রদবদল করা হয়েছে।'

'কি ব্যাপার একটু খুলে বলুন তো?'

'আপনার মীটিঙের ব্যাপারে, স্যার। লবিতে নেমে আসুন, প্লীজ। সময় নষ্ট করবেন না। সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

'গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই আমি। আমার নাম নেলি। আপনাকে মীটিঙের নতুন জায়গায় নিয়ে যেতে পাঠানো হয়েছে। চলে আসুন, প্লীজ।'

বলা হয় ইংরেজদের বংশ কেমন তা জানা যায় তাদের উচ্চারণে। কথার সুর শুনে একে নিম্নমধ্যবিত্ত মজুর শ্রেণীতে ফেলল রানা, পাঁচ মিনিট পর নেমে এল হোটেলের লবিতে। মেয়েটা এখনও কাউন্টারে ফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা ছোট হাতব্যাগ, অস্বস্তি ভরে আঙুল বোলাচ্ছে ব্যাগে।

যুবতী গোল মুখ। চোখ দুটো হালকা নীল। রানাকে দেখে চোখে প্রশংসার ছাপ পড়ল। এগোতে এগোতে বুঝল রানা, ওর অনুমান মিথ্যে নয়। এমেয়ে কড়া মেকআপ নিয়েছে, তবে চেহারা থেকে দারিদ্র্য আর অশিক্ষার ছাপ দূর করতে পারেনি। চুলে সোনালী রং। পরনে লাল টকটকে আঁটো পোশাক। বুকের কাছে চেরা, ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে স্তনের গিরিখাদ দেখা যাচ্ছে।

সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসল রানা। 'কি ব্যাপার, মিস নেলি?'

'আমি কিছু জানি না। আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে ডকে পৌঁছে দিতে।

বলা হয়েছে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। ওরা বলল এটুকু বললেই আপনি বুঝবেন।'

ওরা কারা, জিজ্ঞেস করল না রানা। শুরু থেকেই গোটা ব্যাপারটা ভাল লাগছে না ওর। পাসওয়ার্ড বলেনি মেয়েটা, সম্ভবত জানে না। একে বলা হয়নি পাসওয়ার্ড। একে স্রেফ খবর দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সবকিছুই ধোঁয়া ধোঁয়া, রহস্যে ঘেরা। তবে যাওয়া উচিত ওর। জানা দরকার কি ব্যাপার। জিজ্ঞেস করল, 'একজন মহিলা পাঠিয়েছে আপনাকে?'

'না, পুরুষ,' একটু দ্বিধা করে বলল নেলি, রানাকে দেখছে অনুসন্ধিৎসু চোখে।

'চলুন তাহলে,' দরজার দিকে পা বাড়াল রানা।

একটা বেবি অস্টিন গাড়ি নিয়ে এসেছে মেয়েটা, রানা উঠে বসল তার পাশে। ঝলমল করছে রাতের লন্ডন। রাস্তার দু'পাশে দোকানের সারি, জ্বলজ্বল করছে রংবেরঙের নিয়ন সাইনগুলো। ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে চলেছে মেয়েটা। একটু পরেই বিলিংসগেট মার্কেট আর গম্ভীর দর্শন ওল্ড টাওয়ার পেছনে পড়ে গেল।

ডক এরিয়ায় চলে এল ওরা। রাস্তাগুলো সরু-সরু। বাঁক নিয়ে অপ্রশস্ত একটা রাস্তায় পড়ল বেবি অস্টিন। একটু পরই দেখা গেল জাহাজগুলো, আলো জ্বলছে ওগুলোয়, মালামাল উঠছে-নামছে। রাস্তার উল্টো পাশে অন্ধকার ওয়্যারহাউসের সারি। অন্যপাশে জাহাজগুলোর খোলের গা ঘেঁষে বড় বড় ক্রেট আর যন্ত্রপাতি।

লন্ডনের ডকটা স্বাভাবিক নয়। নদীর তীরে মাটি কেটে জাহাজ আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঁচটা অংশে বিভক্ত বিশাল এলাকা। বেশ কয়েকটা সংকীর্ণ প্যাসেজ দিয়ে টেমসের সঙ্গে ডকের যোগাযোগ। প্যাসেজগুলো দিয়ে জাহাজ আসে। একই সঙ্গে একশোটার বেশি সমুদ্রগামী বড় জাহাজ ধরে কৃত্রিম এই বন্দরে।

আলো আর লোকজন ছাড়িয়ে আরও এগোল নেলির অস্টিন, অন্ধকার একটা এলাকায় চলে এল। কর্মতৎপরতা নেই এখানে। অন্ধকার, নির্জন, নীরব। ডকের পাশে অসংখ্য পরিত্যক্ত পুরানো জাহাজ। কোনও আলো জ্বলছে না সেগুলোতে।

ঘাড়ের কাছে কয়েকটা চুল দাঁড়িয়ে গেল রানার, অস্বস্তি বোধ করছে। এই অনুভূতি চেনে ও। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিপদের সংকেত দিচ্ছে। সাধারণত ভুল করে না ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

বিপদের কোনও আভাস নেই, তবু সতর্ক হয়ে উঠল রানা। অজান্তেই একবার ওয়ালথার পি. পি. কে. স্পর্শ করল। অন্ধকার কোনও নির্জন জায়গায়

গোপন মীটিঙের ব্যবস্থা করা হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু খটকা লাগছে। ঘড়ি দেখল।

রাত বারোটা বাজে এখন।

গাড়ি থামিয়ে বাইরে তাকাল নেলি, চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। রানা দেখতে পেল দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে মেয়েটা।

'এখানেই তো,' বলল নেলি, 'পিয়ার সাতাত্তর।'

একপাশে অন্ধকার একটা পরিত্যক্ত ফ্রেইটার, ওটার কার্গো বুম কালো আকাশে মাথা তুলে আছে, অন্ধকারে আরও অন্ধকার একটা বিশাল অবয়ব। জাহাজের খোলের পাশে ছ'সাতটা ক্রেট আর বাক্স। ডকের উল্টোপাশে নিচু একটা দীর্ঘ ওয়্যারহাউস।

'নামুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'আমি ড্রাইভারের দরজা দিয়ে বেরোব।'

'নামব? আমি?' মেয়েটার গলায় ভয় আর অস্বস্তি। 'আমি না, লাভ, আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি, এই ভুতুড়ে জায়গায় আমি নামব না।'

'নামো।' কণ্ঠস্বর বদলে ফেলেছে রানা। এবার কঠোর শোনাল ওর গলা। একহাত মেয়েটার কাঁধে রাখল ও, হালকা ঠেলা দিল। দেখতে পেল ভয়ে চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেছে নেলির। আস্তে করে দরজা খুলে শরীর কাত করে বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে। ওর ঠিক পেছনেই বের হলো রানা। সোজা হয়নি তখনও, গুলির আওয়াজ হলো। একসঙ্গে গুলি করেছে দু'তিনজন। একটা গুলি রানার কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল। ঠং করে গাড়ির ছাদে বিঁধল আরেকটা।

তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার করে উঠল নেলি, রানার দেখাদেখি মাটিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, পড়েই গড়িয়ে চলে গেল গাড়ির তলায়।

উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রানা। এত দ্রুত গোলাগুলি হয়েছে যে খুনীদের অবস্থান ও বুঝতে পারেনি। তবে খসখস আওয়াজ হওয়ায় টের পেল, বাম পাশে আর পেছনে আছে ওরা। মেয়েটার দিক দিয়ে না নামলে সরাসরি গুলির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হত। অন্য পাশ দিয়ে নেমেছে, তাছাড়া কালো সুট পরে আছে, পেছনে অন্ধকার জাহাজ, সামনে গাড়ি—নানা কারণে ওকে ফুটো করতে পারেনি লোকগুলো। তবে এখন ওঠার চেষ্টা করলে বিপদ বাড়বে। কাছেই আছে খুনীর দল, ওদের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে কোনও আড়াল পাবে না ও, গুলি খেয়ে মারা পড়বে।

চুপচাপ মড়ার মত পড়ে থাকল রানা।

এক মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর পায়ের আওয়াজটা শুনল রানা, ধীরে ধীরে সাবধানে এগিয়ে আসছে।

চারপাশে কোথায় কি আছে মনের চোখে দেখল রানা। সবচেয়ে কাছে আড়াল পাচ্ছে ও জাহাজের দিকটায়। কয়েকটা ক্রেট পড়ে আছে পাড়ে, ওগুলো পেরোতে পারলেই জাহাজের খোলের কাছে পৌঁছে আড়াল নিতে পারবে। পায়ের শব্দ রানার মাথার কাছে এসে থামল ভয় লাগল রানার, গুলি করে পরে লাশ পরীক্ষা করবে নাকি ব্যাটা!

নাহ্। বুকে স্বস্তির পরশ অনুভব করল।

একটা হাত ওর মাথা স্পর্শ করেছে। আরেক হাতে নিশ্চয়ই অস্ত্র। শিথিল পড়ে থাকল রানা, লোকটাকে সুযোগ দিল ওকে কাত করার। তারপর কোব্‌ল্ পাথরের মেঝেতে সজোরে পায়ের ধাক্কা দিল ও, শরীর মুচড়ে কাত হয়েই দু'হাতে টান দিল লোকটার গোড়ালি ধরে। প্রচণ্ড টানে ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে আছাড় খেল লোকটা। বুম! গর্জে উঠল তার হাত থেকে ছিটকে যাওয়া অস্ত্র। পাথরে লেগে পিছলে গেল বুলেট, রিকোশে-র তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো।

লোকটা হাঁটুতে ভর দিয়ে বসার আগেই ঝাঁপ দিয়েছে রানা, দুই লাফে প্যাকিং ক্রেটের কাছে পৌঁছে গেল। লাফ দিয়ে ক্রেট টপকে ওপাশে পড়ল ও। উঠেই ক্রেটের ওপর দিয়ে উঁকি দিল। অন্ধকার অবয়বের নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারল ডকের ওদিকে আরও দু'জন আছে। সবমিলিয়ে তিনজন আততায়ী।

ক্রেটের পেছনে ছুটল রানা, চলে এল সওদাগরী জাহাজের গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের মইয়ের কাছে। দেরি না করে ওপরে উঠতে শুরু করল মই বেয়ে, অন্ধকার খোলের গায়ে আবছা একটা আকৃতি।

ওকে খুঁজে বের করতে আধ মিনিটও লাগল না গুপ্তঘাতকদের। তারপরই সহজ একটা টার্গেট হয়ে গেল রানা। ততক্ষণে ডেকের কাছে পৌঁছে গেছে ও।

গুলি করল আততায়ীরা। তাড়াহুড়ো করায় ধারে-কাছে এল না গুলি। রেলিং টপকে জাহাজের ডেকে উঠে পড়ল রানা, এখন আর ওকে দেখতে পাচ্ছে না লোকগুলো। তবে রানা জানে, ওর পেছনে আসবে লোকগুলো, এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। অন্ধকার জাহাজের হোল্ডে গিয়ে লুকাতে পারে ও, সেখানে হয়তো ওকে খুঁজে পাবে না লোকগুলো, কিন্তু হোল্ড একটা মৃত্যুফাঁদও হতে পারে। হোল্ডে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল ও। নড়েচড়ে বেড়ানোর সুযোগ আছে এমন জায়গাতেই থাকা ভাল।

জাহাজের ব্রিজে চলে এল, হাতে বেরিয়ে এসেছে থ্রোইং নাইফটা। ওখানে সিঁড়ির গোড়ায় মেঝেতে পেট ঠেকিয়ে শুয়ে অপেক্ষায় থাকল, নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। শিকার এখন শিকারী।

লোকগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, এখন আর দ্রুত পাল্টা আক্রমণের সুযোগ নেই। বো আর অ্যাফটে রেলিঙের পেছনে দুটো মাথা দেখতে পেল রানা। তৃতীয়

লোকটা কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ব্রিজের দিকে আসছে।

মাথা সিঁড়ির শেষ ধাপ ছাড়াতেই শুয়ে থাকা রানাকে দেখতে পেল লোকটা। ডানহাত তুলল সে অস্ত্রসহ, নলটা আকাশের দিকে তাক করা। ঝটকা দিয়ে হাত সামনে বাড়াল রানা। তীক্ষ্ণধার ছোরাটা নক্ষত্রের আলোয় ঝিলিক তুলে ঘ্যাঁচ করে আমূল বিঁধল লোকটার গলায়। উল্টে পড়ে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে চট করে তাকে ধরে ফেলল রানা, লাশটা তুলে নিল ব্রিজে। ছোরার ফলা লাশের কাপড়ে মুছে নেমে এল মেইন ডেকে, এগোল হামাগুড়ি দিয়ে।

দ্বিতীয় লোকটা একটা একটা করে প্রতিটা বুমের পেছনে ওকে খুঁজছে, অন্ধকার উইঞ্চ আর ভেন্টিলেটারগুলোও বাদ দিচ্ছে না। সাবধানে তার দিকে এগোল রানা। ছয় ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে, তখন ওকে দেখতে পেল লোকটা। নিঃশব্দে কাজ সারতে বাঘের মত লাফ দিল রানা ওর উদ্দেশ্য পূরণ হলো না, হাত তুলেই গুলি করে বসল প্রতিপক্ষ। রানার চুলে বিলি-কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। পরিত্যক্ত জাহাজে গুলির শব্দটা প্রচণ্ড জোরাল শোনাল। কানের এত কাছে বিস্ফোরণটা হয়েছে যে রানার মনে হলো বধির হয়ে গেছে ও। রানার দেহের ধাক্কা খেয়ে পিছু হটল লোকটা, একটা ডেক ক্লিটের গায়ে বাড়ি খেল, গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। আগের লোকটার তুলনায় দেহ ভারী এর, আকার আকৃতিতেও বিশাল। খপ করে লোকটার অস্ত্রসহ কব্জি ধরে মোচড় মারল রানা। লোকটা খুঁটির কাছে থেকে সরল। হাত ফস্কে পড়ে গেল অস্ত্রটা।

রানার মুখে হাতের থাবা ঠেকিয়ে পেছনে ঠেলল লোকটা। মোচড় মেরে সরে গিয়েই শর্ট জ্যাব করল রানা। চোয়ালে ঘষা খেয়ে পিছলে গেল ওর ঘুসি। ভালুকটা জড়িয়ে ধরল ওকে। গায়ে গ্রিজলির মত জোর। পাঁজরের হাড় মড়মড় করে উঠল রানার। আগুয়ান ছুটন্ত পায়ের শব্দ পাচ্ছে ও, কাছে চলে আসছে। সুযোগ বুঝে রানার গলা চেপে ধরল লোকটা। ঝট করে হাঁটু তুলেই তলপেটে গুঁতো মারল রানা ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল প্রতিপক্ষের মুখ দিয়ে, পিছিয়ে গেল রানাকে ছেড়ে, পরমুহূর্তেই আবার জড়িয়ে ধরল। রানাকে শূন্যে তুলে ফেলেছে সে, বক্কুর সুবিধের জন্যে ওর দেহটা পাশ ফেরাল।

শরীর মুচড়ে আরও একটু ঘুরল রানা ভালুকের বাহুর ভেতর, তারপর পা তুলেই গায়ের জোরে লাথি মারল তৃতীয় লোকটার চোয়ালে। খটাস করে আওয়াজ হলো চোয়ালের সঙ্গে ওর শক্ত হিলের সংঘর্ষে থরথর করে কেঁপে উঠে থমকে থেমে গেল তৃতীয়জন। চোয়ালের জয়েন্ট খুলে গেছে, তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ডেকের ওপর পড়ে গেল, নড়ছে না। কুস্তিগিরের বুকের হাড়ে এবার কনুই দিয়ে চাপ দিল রানা। চাপ বাড়াল। রানাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো লোকটা, মেঝেয় পড়া অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল তার হাত অস্ত্র ছোঁয়ার আগেই ওয়ালথার বেরিয়ে

এল রানার হাতে, বিনা দ্বিধায় গুলি করল লোকটার কপালে। একপাশে কাত হয়ে ডেকের ওপর পড়ল লোকটা। থপ করে আওয়াজ হলো। ব্যথা টের পাবার আগেই মারা গেছে।

কাউকে সার্চ করার ঝামেলায় গেল না রানা, ওর ভাল করেই জানা আছে এদের পরিচয় জানা যাবে না। যে-ই এদের পাঠিয়ে থাকুক, কাঁচা কাজ করবে না। পেশাদার লোক ছিল এরা।

কে পাঠিয়েছে এদের?

মোসাদ? ভাড়াটে খুনী এরা, নাকি মোসাদের এজেন্ট?

পরে ভাবা যাবে ওসব। যথেষ্ট গোলাগুলি হয়েছে। যেকোনও সময়ে লন্ডন পুলিস হাজির হতে পারে। গ্যাংওয়ের মই বেয়ে নামতে নামতে দেখল রানা, গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে আসছে নেলি। নামার গতি দ্রুত হলো রানার। ও গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে, স্টার্ট নিল গাড়ি। গিয়ার দিল নেলি, ওকে ফেলেই পালানোর মতলব। জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ইগনিশন বন্ধ করে দিল ও, পরক্ষণে আঁউ করে উঠল ব্যথায়। ওর কব্জিতে কামড় বসিয়েছে নেলির ধারাল দাঁত। হাত ছাড়িয়ে নেবার বদলে মেয়েটার মুখে ঠেলা দিল রানা, আরেক হাতে মুঠো করে ধরল সোনালী রং করা চুল, টান দিল গায়ের জোরে। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই গলায় চাপ দিল।

চাপ বাড়াতেই বিস্ফারিত হয়ে গেল মেয়েটার দু'চোখ। রানার চেহারা কঠোর। 'আমাকে খুন কোরো না,' অস্ফুট স্বরে বলল নেলি। 'ওহ্, লর্ড, প্লীইজ! আমি জানতাম না! আমি কিছু জানতাম না!'

'কারা ওরা?'

'বিশ্বাস করো, আমি জানি না। সত্যি বলছি। আমি কিছু জানি না।'

চাপ আরও বাড়াল রানা। পারলে চিৎকার করত মেয়েটা, কিন্তু শ্বাস আটকে যাওয়ায় সে সাধ্য হলো না। কোনও মতে ফিসফিস করতে পারছে।

'আমাকে পয়সা দিয়ে যা করতে বলেছে তা-ই শুধু করেছি।' ফোঁপাচ্ছে নেলি। 'সত্যি বলছি, ঈশ্বরের শপথ! ও আমাকে বলেনি এরকম কিছু হতে পারে। জানলে আমি আসতাম না। ঈশ্বরের শপথ, আসতাম না। আমার এক বছরের রোজগারের সমান টাকা দিয়েছে, তবুও না। বিশ্বাস না হলে দেখাচ্ছি।'

রানা গলায় চাপ কমাতেই পার্সের দিকে হাত বাড়াল মেয়েটা। থাবা দিয়ে তার হাত সরিয়ে পার্সটা নিয়ে নিল রানা। ভেতরে কোনও অস্ত্র নেই। শুধু এক গাদা পাউন্ড। পার্সটা মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিল রানা। এত টাকা পেয়েছে একজনকে কোথাও পৌঁছে দেবার জন্যে, মেয়েটার আন্দাজ করতে পারার কথা এর মধ্যে গলদ আছে। গুলি হবার আগেই মেয়েটাকে ভীত দেখাচ্ছিল। টাকার

লোভে বেশি প্রশ্ন না করে কাজটা হাতে নিয়েছে নেলি। কিন্তু কে তাকে কাজটা দিল সেটা এখনও বলেনি। আবার নেলির গলায় হাত দিল রানা, দেখল ভয়ে আবার বিস্ফারিত হয়ে গেছে মেয়েটার চোখ দুটো।

'একটু আগে বললে ও বলেনি। এই ও-টা কে? মিথ্যে বলে লাভ নেই, নেলি, আমি বুঝতে পারব।'

'আমার বয়ফ্রেন্ড। একটা পাবে কাজ করি আমি। ওখানে ও প্রায়ই যায়। আমাকে বলল ওর পরিচিত একজনের হয়ে ছোট্ট একটা কাজ করে দিলে প্রচুর টাকা পেতে পারি আমি।'

'নাম কি তোমার বয়ফ্রেন্ডের?'

'টড। টড রলিন্স।'

ঘড়ি দেখল রানা। রাত এখন একটা। বলল, 'তোমার বয়ফ্রেন্ডের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে হবে তোমার। তার আগে একবার হোটেলে যাব আমরা। পালানোর চেষ্টা কোরো না, স্রেফ খুন হয়ে যাবে।...আমি ড্রাইভ করব এবার।'

দুটো পর্যন্ত হোটেলে অপেক্ষা করবে, ঠিক করেছে রানা। মহিলা যদি এরমধ্যে যোগাযোগ না করে তাহলে ধরে নেয়া যাবে এটা একটা মরণফাঁদ ছিল। তবে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই, এমনও হতে পারে যে মহিলাকে আগেই শেষ করে দেয়া হয়েছে। দেখা যাক দুটোর সময় ফোন আসে কিনা।

নেলিকে ঠেলে পাশের সীটে সরিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল রানা, এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফিরতি পথ ধরল মূল শহরের দিকে।

তিন

'আমার কি হবে?' কিছুক্ষণ পর কাঁপা গলায় জানতে চাইল নেলি, গম্ভীর লোকটার নীরবতা তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

'সত্যি বলে থাকলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না,' আশ্বাস দিল রানা। 'সত্যি বলছ কিনা সেটা বোঝা যাবে টড রলিন্সের সঙ্গে দেখা হলে। তার আগে পর্যন্ত তুমি আমার বন্দি।'

'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে,' সরাসরি বলল নেলি, একটা হাত রাখল রানার উরুতে। 'সত্যিকারের পুরুষ তুমি। ইচ্ছে করলে আমাকে তুমি পেতে পারো।'

মেয়েটা লোভ দেখিয়ে নিজের নিরাপত্তা আদায়ের চেষ্টা করছে। এতই নগ্ন

চেষ্টা যে রীতিমত লজ্জাই লাগল রানার। অপমান না করে বলল, 'পরে ভাবা যাবে ওসব।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে সীটে হেলান দিয়ে বসল নেলি, স্বস্তি বোধ করছে, আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে মেয়েমানুষের আদিমতম অস্ত্রের সফল ব্যবহার করতে পেরেছে মনে করে।

দুটো বাজার পাঁচ মিনিট আগে হোটেলের কামরায় ঢুকল রানা। ঝামেলা করার কোনও চেষ্টা করেনি নেলি, ঘরে ঢুকে পরপর দু'গ্লাস পানি খেয়েছে। চোখে আমন্ত্রণ নিয়ে বিছানার কোনায় বসেছিল, রানা না তাকানোয় একটু পর উঠে এসে ওর পাশে একটা সোফায় বসেছে। ইচ্ছে করেই ওকে পুরুষ্টু উরু দেখাচ্ছে মেয়েটা স্কার্ট ঠিক না করে।

ঠিক দুটোর সময় রিং হলো। এবারও ওপ্রান্তে মহিলা কণ্ঠস্বর। তবে এবার রাহাত খান যেমন বলেছিলেন উচ্চারণটা তেমনই, আরব-ইসরায়েলীদের বলা ইংরেজি।

'তাহলে এসেছেন আপনি।'

'এসেছি।'

'কেন?'

'আপনি দেখা করতে চেয়েছিলেন।'

'কেন দেখা করতে চেয়েছিলাম?'

'কারণ দুনিয়ার সাহায্য দরকার।'

ওপ্রান্তে স্বস্তির শ্বাস ফেলল মহিলা। কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর বলল, 'আপনি অ্যালটনে চলে যাবেন। ওয়ে নদীর পশ্চিম তীর ধরে হাঁটবেন। অ্যালটনের সিকি মাইল উজানে একটা রো বোট রাখা আছে, সেটাতে করে সেলবোর্নের দিকে এগোবেন। থামবেন পাথরের দ্বিতীয় ব্রিজটার নিচে। ওখানে আমি দেখা করব, ভোর ঠিক ছ'টায়। কোনও প্রশ্ন?'

'নেই।'

কট করে একটা আওয়াজ হলো। ওপ্রান্তে ফোন রেখে দিয়েছে মহিলা।

তিনটে ব্যাপার এখন পরিষ্কার। এক, বিসিআইয়ের কাছে ভুয়া খবর আসেনি। দুই, মহিলা এখনও বেঁচে আছে। তিন, তাকে সম্ভবত নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। যে বা যারা নজরবন্দি করে রেখেছে তারা বিসিআইয়ের কাছে খবর গেছে সেটা জানে, ফলে ফাঁদ পেতেছিল নেলিকে পাঠিয়ে। প্রশ্ন জাগল রানার মনে, ও পৌঁছোনোর আগে মহিলার কাছে পৌঁছে যাবে না তো প্রতিপক্ষ? নির্ভর করে তাদের ফাঁদ ব্যর্থ হয়েছে এখবরটা তারা কখন জানবে তার ওপর।

নেলির দিকে ফিরল রানা। 'স্টকিং খোলো।'

চোখে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল নেলি, বুঝতে পারছে না এত শীতল সুরে কেন বিছানায় ডাকছে লোকটা। দ্বিধা কাটিয়ে উঠল, স্কার্ট আরও ওপরে তুলল গার্টারের বেল্ট খোলার জন্যে। ইচ্ছে করেই দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে। রানা দেখল গোল একটা পেট আছে নেলির, বিয়ের দু'বছরের মধ্যে ওটা নিঃসন্দেহে বিরাট ভুঁড়িতে পরিণত হবে।

স্টকিং খোলা হতেই ওগুলো নিয়ে নিল রানা, সান্ত্বনার সুরে বিস্মিত নেলিকে বলল, 'যা ভাবছ সেটা পরে ভেবে দেখব, কেমন? এখন আমি বাইরে যাচ্ছি একটা কাজে। আমি চাই ফিরে এসে যাতে তোমাকে এখানেই পাওয়া যায়।'

একটা পিঠ উঁচু চেয়ারে বসিয়ে ওরই স্টকিং দিয়ে কষে বাঁধল রানা নেলিকে। গোড়ালি আর কব্জি বাঁধা শেষে নেলির মুখে একটা রুমাল গুঁজে দিল। পরীক্ষা করে দেখল যাতে রুমাল গিলে মারা না পড়ে মেয়েটা। আবার এত শক্ত করেও গোঁজেনি যে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে লোক জড় করতে পারবে। কাজ সেরে সিদ্ধান্তে এল, মেয়েদের পাতলা মোজা দিয়ে সত্যিই চমৎকার ভাবে বাঁধাবাঁধির কাজ করা যায়।

'দরজায় কেউ এলে কষ্ট করে আর জবাব দিতে হবে না তোমাকে,' ঘর ছেড়ে বের হবার আগে আরেকবার সান্ত্বনা দিল রানা। দেখল কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে নেলি। বাইরে এসে দরজায় তালা দিয়ে 'ডু নট ডিস্টার্ব' লেখা কার্ডটা ঝুলিয়ে দিল ও, তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এল নিচে। তিনটে বাজতে পঁচিশ মিনিট। হাতে বেশি সময় নেই। নেলির বেবি অস্টিন আর যা-ই হোক, জেমস বন্ডের অ্যাস্টন-মার্টিন নয়।

মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, লন্ডনের রাস্তা এখন প্রায় ফাঁকা, শুধু মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে দেখা যাচ্ছে একটা দুটো মেয়েকে, রাতের খদ্দের ধরার আশায় এখনও অপেক্ষা করছে।

অ্যালটন লন্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিমে। কেনসিংটন আর চেলসির ভেতর দিয়ে ওল্ড ব্রম্পটন রোড ধরে এগোল রানা। যতটা সম্ভব গতি আদায় করছে বেবি অস্টিনের কাছ থেকে, চোখ কুঁচকে গেছে এঞ্জিনটার আর্তনাদ শুনে। একটু পরপর বাঁক নিচ্ছে কাউন্টি রোড, অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হচ্ছে, বারবার কমাতে হচ্ছে স্পীড। ব্রুকউড, ফার্নবরো আর অ্যাল্ডারশট পেরিয়ে গেল।

অ্যালটন ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। গাড়ির এঞ্জিনের আর্তি ছাড়া চারদিক নীরব। ওয়ে নদীর তীরে একঝাড় বুড়ো ওকের নিচে গাড়ি থামাল রানা। ওয়ে আসলে নামে মাত্র নদী, বাস্তবে বড়সড় একটা ঝর্না ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিম তীর ধরে হাঁটতে শুরু করল রানা। পুব আকাশে সামান্য ধূসর একটা রেখা আসন্ন ভোরের আভাস জানাচ্ছে। মহিলা কুয়াশার কথা বলতে ভুলে গেছে। নদীর

পাড়ে ঘন কুয়াশা। পানিতে যাতে না পড়ে সেজন্যে সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যাচ্ছে কুয়াশার পর্দা, তখন সামনে কয়েক ফুট করে দেখা যাচ্ছে। ছেঁড়া কুয়াশার ভেতর দিয়ে রো বোটটা দেখতে পেল রানা। আরেকটু হলেই পাড়ে অর্ধেক তোলা বোটের গায়ে হোঁচট খেতে হতো।

ঠেলে পানিতে বোট ভাসাল রানা, বৈঠা বাইতে শুরু করল। কুয়াশার চাদর ওকে ঘিরে রেখেছে। বৈঠা পানিতে পড়ার মৃদু ছলাৎ-ছল শব্দ ছাড়া চারপাশ নীরব। আকাশে ধূসর রঙের বিস্তৃতি বেড়েছে, কিন্তু কুয়াশা কাটেনি। সূর্য মাঝ আকাশে ওঠার আগে পর্যন্ত কুয়াশার দৌরাত্ম্য সাধারণত কমে না ব্রিটেনে। আর্চের ভারী পাথরগুলো পাশ কাটিয়ে একটা ফুট-ব্রিজ পার হলো রানা, প্রায় দেখাই যায় না ব্রিজটা। ঘড়ি দেখল। হাতে বেশি সময় নেই। বৈঠা চালানোর গতি বাড়াল।

সিকি মাইল পার হবার পর আরেকটা ব্রিজের স্প্যান দেখতে পেল। কাছে যেতে বোঝা গেল, কাঠের তৈরি। সামনে বাঁক নিল নদী। বাঁকটা পার হতেই আরেকটা আর্চড্ ব্রিজ দেখা গেল। কুয়াশায় মোড়া নিথর প্রাচীন ব্রিজটা দেখতে ভুতুড়ে আর পরিত্যক্ত মনে হচ্ছে। পাথরের তৈরি ব্রিজের ওয়াকওয়ে কাঠের, দেখে মনে হয় যেকোনও সময়ে ভেঙে পড়বে।

ব্রিজের কাছে নৌকো থামাল রানা, অপেক্ষা করছে। ওর ঘড়িতে ছ'টা বাজে।

এক…দুই…তিন…করে দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, কেউ এল না।

অস্বস্তি বোধ করছে রানা। প্রতীক্ষা সবসময়েই অস্বস্তিকর। সন্দেহ হলো, তাহলে কি ওর আগেই মহিলার কাছে পৌঁছে গেছে আততায়ীরা! ঠিক করল আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখবে।

দু'মিনিট পর বৈঠার আওয়াজ পেল ও, উজান থেকে আসছে। ওয়ালথার পি.পি.কে. বের করে অপেক্ষায় থাকল। ব্রিজের এপারে ওর সঙ্গে দেখা হবে অন্য নৌকোটার। চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে রানা। কুয়াশার ভেতর আবছা ভাবে দেখা গেল ওটা। কে যেন বসে আছে বৈঠা হাতে। মহিলা না পুরুষ বোঝা গেল না। থেমে গেল নৌকোটা। মাঝখানে বিশ ফুট মত দূরত্ব। পানির ওপর দিয়ে ভেসে এল গলা। টেলিফোনের সেই মহিলার উচ্চারণ আর এর উচ্চারণ এক।

'ভাল, আপনি এসেছেন,' টেলিফোনের কণ্ঠের চেয়ে মোটা শোনাল কণ্ঠস্বর। রানা আন্দাজ করল, কুয়াশার কারণেই সম্ভবত এই জায়গা বেছেছে মহিলা, চায় না ও তাকে দেখতে পাক। মহিলা মধ্যবয়স্কা হবে। ধীর স্বরে বলল মহিলা, 'একটা কথা প্রথমেই আপনাকে বুঝতে হবে। আমি বিশ্বাসঘাতক নই।'

চুপ করে থাকল রানা।

'আমি জানি ওরা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে,' বলে চলল-মহিলা। 'আমার মনোভাব সরাসরি ওদেরকেই জানিয়েছিলাম। যেকোনও দিন আমাকে লন্ডন থেকে

সরিয়ে দেয়া হবে, সেজন্যেই এই মীটিঙের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।'

ওর ওপর হামলা হয়েছে সেটা আপাতত মহিলাকে না জানানোর সিদ্ধান্ত নিল রানা। মহিলা জানে না কতটা কাছ থেকে তাকে নজরে রাখা হচ্ছে। হামলার কথা বললে মহিলা হয়তো এক্ষুণি পালানোর চেষ্টা করবে। কথা শুনে এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করছে মহিলা।

'আমি আমার দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না, বুঝেছেন?' আবারও বলল মহিলা। 'এমন কোনও প্রশ্ন করবেন না যেটার উত্তর দিতে হলে আমার দেশের ক্ষতি হয়। যতটুকু বলব ঠিক করেছি ঠিক ততটুকুই বলব। বুঝেছেন?'

ভুল করছে কিনা সেটা ভেবে মহিলা বেশ দ্বিধান্বিত। নিজেকেই বুঝ দেয়ার চেষ্টা করছে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না। কাজের কথায় আসা দরকার, অনুভব করল রানা। একটু পরই কুয়াশা পাতলা হতে শুরু করবে, তখন আবার মহিলা কি বায়নাক্কা করে কে জানে!

'আপনার বক্তব্য শোনার পর আমি বুঝতে পারব কোনও প্রশ্ন করতে হবে কিনা,' বলল ও। 'শুরু থেকে বলুন।'

'চুপচাপ বসে থেকে ঘটনাটা ঘটতে দেয়া আর সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। এই মানুষগুলো পৃথিবীর জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিজ্ঞানীরা। অনেক দ্বিধায় ভুগে তাই ঠিক করেছি আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তা আমি করব। আমি...'

টাশ্!

মহিলা আর কিছু বলতে পারল না, আস্তে করে কাত হয়ে সীট থেকে ঢলে পড়ল।

রানাও ঝট করে শুয়ে পড়ল নৌকোর পাটাতনে। ঠক করে একটা বুলেট বিঁধল ওর সীটের পিঠে। লোকটা যে-ই হোক, নির্ভুল তার লক্ষ্য। আওয়াজ কমাবার জন্যে লো ক্যালিবার রাইফেল ব্যবহার করছে।

নৌকোটা ব্রিজের অন্যপাশের স্প্যানের দিকে ভেসে যাচ্ছে। বিপরীত দিকে কোথাও আছে আততায়ী! একটু পরই রানাকে নিশানায় পেয়ে যাবে।

গলুইয়ের ওপর দু'হাতের ভর দিয়ে টুপ করে রানা নেমে গেল নদীতে। একটু আগে যেখানে ওর হাত ছিল সেখানে লেগে কাঠের কুচি ছিটাল তৃতীয় গুলি। ততক্ষণে পানিতে ডুব দিয়েছে রানা। নদীর পানি বেশ ঠাণ্ডা, তাছাড়া পুরোদস্তুর পোশাক পরে আছে ও, সাঁতার কাটতে অসুবিধে হচ্ছে। ডুব সাঁতার দিয়ে ব্রিজের তলায় মাঝামাঝি জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করল। ভেসে উঠল দম ফুরিয়ে যেতে।

ব্রিজের ঠিক তলায় আছে ও এখন। ওপরে কাঠের ওয়াকওয়েতে লোকটার পদশব্দ শুনতে পেল। ও কোথায় আছে জানে গুপ্তঘাতক, সেজন্যেই ব্রিজের

স্প্যানের শেষ প্রান্তের দিকে যাচ্ছে, যাতে নেমে এসে সহজেই কাছ থেকে গুলি করে মারতে পারে।

যতটা সম্ভব নীরবে স্প্যানের উদ্দেশে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা, কাপড়চোপড় আর জুতো ভিজে যাওয়ায় মনে হলো গায়ে এক বস্তা সিমেন্ট বেঁধে দিয়েছে কেউ।

ব্রিজ যেখানে ঢালু হয়ে তীরে মিশেছে, সেখানে স্প্যানের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা কোমর পানিতে। একটা পাথর ঠোকর খেতে খেতে গড়িয়ে নামল ঢাল বেয়ে। এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে সতর্ক লোকটা। তীরে চলে এসেছে প্রায়, ব্রিজের পিলারের পাশে আগে দেখা দিল তার রাইফেলের নল। কুঁজো হয়ে সামনে বাড়ছে লোকটা, চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে কুয়াশা ভরা ব্রিজের তলায়।

সুঠামদেহী দীর্ঘকায় লোক। দড়ির মত পাকানো পেশি। একটা কভারল পরে আছে।

লোকটা আওতার মধ্যে আসতেই স্প্যানের গায়ে প্রাণপণে লাথি মারল রানা, একই সঙ্গে ঝাঁপ দিল লোকটাকে লক্ষ্য করে। পানিতে পড়ল দু'জন। লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরেছে রানা। ওর হাত ছাড়াতে গিয়ে আততায়ীর রাইফেলটা ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে তলিয়ে গেল। কোমর ছেড়ে গায়ের জোরে লোকটার মুখে ঘুসি মারল রানা। মনে হলো মুগুরের বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়েছে লোকটা। দ্রুত সামলে নিয়ে ডুব দিল, রানার তলায় হাজির হওয়ার ইচ্ছে। চট করে সরে গেল রানা। লোকটা ভেসে উঠতেই পেয়ে গেল হাতের নাগালে। লোকটাও ওকে পেয়েছে বলা যায়। একই সঙ্গে ঘুসি মারল দু'জন। রানারটা এড়িয়ে গেল লোকটা, তারটা রানা এড়াতে পারল না। মাথাটা ঘনঘন দু'বার ঝাঁকি খেল ওর। চোখের সামনে অন্ধকার দেখল। রানার দ্বিতীয় ঘুসিও ব্যর্থ হলো। আবার মারল লোকটা ওকে। এক পিসের কভারল পরে থাকায় রানার তুলনায় পানিতে অনেক দ্রুত শরীর নড়াতে পারছে আনআর্মড্ কমব্যাটে দক্ষ লোকটা।

রানার মনে হচ্ছে ওর হাতে বাড়তি ওজন চাপিয়ে মুষ্টিযুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হয়েছে।

পানি কেটে সামনে বাড়ল লোকটা, নিজের সুবিধে সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। দু'হাত ঘুরিয়ে গায়ের জোরে কয়েকটা ঘুসি মারল রানার বুক-পেট লক্ষ্য করে। ঠেকাতে চেষ্টা করেও পারল না, থরথর করে কেঁপে উঠল রানা, পিছিয়ে গেল। তীরে উঠলেও বাড়তি সুবিধেটা পাবেই এ লোক। এখনই ভারী ভারী ঠেকছে রানার দু'হাত, মনে হচ্ছে বিশ্রাম দরকার।

পিছিয়ে গেল রানা, বড় করে দম নিল, তারপর ডুব দিয়ে জড়িয়ে ধরল

লোকটার দুই পা, টান দিল গায়ের জোরে। এতই দ্রুত ঘটল ব্যাপারটা যে বিস্মিত আততায়ী দম নেবার আগেই তলিয়ে গেল। গত কয়েকদিন ঢাকা ক্লাবের সুইমিং পূলে প্রায় সারাদিন সাঁতার কেটেছে রানা, ও আশা করছে দমে হারাতে পারবে প্রতিপক্ষকে। রানার ঘাড়ে একের পর এক ঘুসি লাগছে। পানির তলায় ওগুলোকে মনে হচ্ছে হালকা চাপড়। মাছের গায়ে কাঁকড়া যেমন করে সেঁটে যায়, তেমনি করে আঁকড়ে ধরে থাকল রানা। মোচড়ামোচড়ি করে মহামূল্যবান শ্বাস নষ্ট করছে লোকটা। রানা শুধু প্রাণপণে তাকে ধরে আছে পানির নিচে। কিছুক্ষণ মাত্র, লোকটার ঝটকাঝটকি দুর্বল হয়ে এলো। রানারও দম প্রায় শেষ, মাথার মধ্যে দপদপ করছে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি ফেটে যাবে ফুসফুস।

হঠাৎ করেই লোকটার দেহ শিথিল হয়ে গেল। আরও পাঁচ সেকেন্ড তাকে পানির নিচে ধরে থাকল রানা, তারপর ছেড়ে দিয়ে ওপরে মাথা জাগাল, শ্বাস নিল ফোঁস-ফোঁস করে। নদীতে স্রোত সামান্যই। আধমিনিট পর দেহটা ওর গায়ে ঠেকল। চুল ধরে টেনে মুখটা তুলল পানির ওপর। চেহারা দেখে আরব বলে মনে হয়। ইসরায়েলীও হতে পারে। লাশটা তীরের কাছে নিয়ে এল রানা, কভারল খুলে আইডেন্টিটি খুঁজল। আশা করেনি, পেলও না কিছু। কিন্তু কভারলের নিচে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা ছোট রেডিয়োর সমান একটা ওয়াকিটকি পাওয়া গেল। যারাই ওর পেছনে লেগে থাকুক, তারা সংঘবদ্ধ এবং বেপরোয়া।

মোসাদ?

যারা রানাকে ডকে আক্রমণ করেছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এর। এ নজর রাখছিল মহিলার ওপর। রানা সশরীরে হাজির হতেই এ বুঝে নিয়েছে কোথাও কোনও গোলমাল হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আসল জায়গায় খবর পাঠিয়েছে, তারপর তাদের নির্দেশ মোতাবেক হামলা করেছে। পেশাদার লোক এরা, গুপ্তচরবৃত্তির যে নিয়ম মেনে কাজ করছে সে নিয়ম মোসাদ মেনে চলে।

দুটো নৌকোই নদীর ওপারে গিয়ে ভিড়েছে। তীরে উঠে দ্রুত পায়ে ব্রিজ পেরিয়ে মহিলার নৌকোর কাছে চলে এল রানা। মহিলা বেঁচে নেই। কপালে গুলি খেয়েছে। চুলে পাক ধরেছিল। বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ। যৌবনে চেহারা সুন্দর ছিল।

সময় নষ্ট না করে তার পরনের বাদামী কোট খুলে ফেলল রানা, আপাদমস্তক সার্চ করল। কোনও পার্স নেই। কোটের কলারে একটা নাম ওর নজর কাড়ল। মারিয়া গোল্ডামেয়ার। নামটা মনে গেঁথে নিল রানা, আস্তে করে মহিলাকে শুইয়ে দিল নৌকোয়। খারাপ লেগে উঠল ওর, মহিলা যেটা দায়িত্ব মনে করেছিল সেটা পালনের চেষ্টা করতে গিয়ে মারা গেছে। খুব বেশি মানুষ দেশ বা জাতির উর্ধ্বে উঠে পৃথিবীর মঙ্গল চিন্তা করে না।

নিজের নৌকোয় ফিরে ভাটির দিকে বৈঠা বেয়ে চলল রানা, মুখটা কঠোর।

কেউ একজন খেলাচ্ছে ওকে, শেষ করে দিতে চাইছে। কে তা জানে না ও। আন্দাজ করতে পারে।

মোসাদ।

আপাতত রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করবে না, ঠিক করল রানা। ওর নাকের ডগা থেকে কন্ট্যাক্টকে শেষ করে দিয়েছে মোসাদ। এখনও কোনও কিছু সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনও ধারণাই হয়নি। রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে দেবার মত কোনও তথ্য নেই ওর হাতে।

বেশিক্ষণ অন্ধকারে থাকবে না ও, বৈঠা দ্রুত চালাতে চালাতে ভাবল রানা। শীঘ্রি কিছু না কিছু জানা যাবে। নেলি আছে ওর হাতে। তথ্য আদায় করতে হবে নেলির বয়ফ্রেন্ডের কাছ থেকে।

লন্ডনের রাস্তায় ভিড়। বেবি অস্টিন চালিয়ে হোটেলে ফিরছে রানা, কোনও তাড়াহুড়ো নেই ড্রাইভিঙে। দেখলে কেউ মনে করবে দেরি করে কাজে যাচ্ছে ব্যাটা, আবার ধীরেসুস্থেও যাচ্ছে, এ বোধহয় ব্যবসায়ী।

চার

আগের জায়গাতেই আছে নেলি, হাত-পা বাঁধা, রানা ঘরে ঢুকতে হিংস্র চোখে তাকাল, গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরোল গলা দিয়ে। পাত্তা দিল না রানা, মেজাজটা এমনিতেই খিঁচড়ে আছে, বাথরুমে ঢুকে কাপড় পাল্টাল, তারপর বেরিয়ে এসে বাঁধন খুলল মেয়েটার। স্টকিঙের অবস্থা দেখে বুঝল চুপচাপ বসে ছিল না নেলি, ছুটে যাবার জন্যে সাধ্যমত টানাহ্যাঁচড়া করেছে, ফলে আরও এঁটে বসেছে স্টকিংস।

'ব্যথা!' রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় কজি ডলতে ডলতে মুখ কুঁচকে বলল নেলি। 'মাথা ঘুরছে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাব মনে হচ্ছে।'

'বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'দেরি কোরো না, তোমার বয়ফ্রেন্ডের ওখানে আমাকে নিয়ে যাবে তুমি।'

'এখন ও ঘুমাচ্ছে,' প্রতিবাদের সুরে বলল নেলি, 'সারারাত ফুর্তি করে ভোরে ঘুমায় ও।'

'তাহলে আজকের দিনটা ওর জন্যে ব্যতিক্রম হবে।'

লাল পোশাকটা মাথা গলিয়ে খুলে ফেলল নেলি, পরনে শুধু লাল ব্রা আর লাল প্যান্টি, রানার দিকে তাকাল, চোখে আবার আমন্ত্রণ ফুটিয়ে তুলেছে,

ভাবখানা, কেমন দেখছ মিয়া, পছন্দ হয়েছে?

শীতল হাসল রানা, চোখদুটো কঠোর। দেখল এক পলকে আত্মবিশ্বাস দূর হয়ে গেছে মেয়েটার, টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সোফায় বসে আড়মোড়া ভাঙল রানা, বসে বসে কয়েক রকম স্ট্রেচিং করে শরীরের পেশি শিথিল করে নিল। টয়লেটে ঝিরঝির করে আওয়াজ হচ্ছে, গোসল করছে নেলি। কিছুক্ষণ চোখ বুজে বিশ্রাম নিয়ে নিল রানা। নেলি বেরোতে চোখ মেলল। নিজেকে একদম তাজা মনে হচ্ছে, যেন সারারাত ও ঘুমিয়েছে আরামে।

নেলির বয়ফ্রেন্ডের অ্যাপার্টমেন্ট সোহোতে। দরিদ্রদের ডিস্ট্রিক্ট। ছোট-ছোট স্টেশনারি দোকান, পাব, নাইট ক্লাব আর এক রুমের অ্যাপার্টমেন্টের রাজ্য। এখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি লেগেই আছে সর্বক্ষণ।

সরু গলির ভেতর দিয়ে বেবি অস্টিন নিয়ে চলল রানা। যতই গন্তব্যের কাছে পৌঁছোচ্ছে, ততই নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে নেলি। দু'হাত এক করে মোচড়ামুচড়ি শুরু করেছে।

'অপেক্ষা করলে হয় না?' শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলল নেলি। 'টডের ঘুম খুব গাঢ়। সকালে কেউ ডিস্টার্ব করলে সাংঘাতিক খেপে যায়।'

ঘুম ভাঙানোয় যদি না-ও খেপে টড, নেলি তাকে ধরিয়ে দেয়ায় খেপবে। কিছু বলল না রানা, একমনে গাড়ি চালাচ্ছে।

নেলি ওকে পথ দেখিয়ে একটা গলির শেষ প্রান্তে নিয়ে এল। জানা গেল পরিত্যক্ত চেহারার রং চটা ধূসর তিনতলা বাড়িটার তৃতীয় তলায় টডের আবাস।

টডের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে রানা বলল, 'তুমি টোকা দাও। ভেতর থেকে কে তা জানতে চাইলে জবাবও দেবে তুমি।'

টডের ঘুম কুম্ভকর্ণের মত, ঠিকই বলেছিল নেলি। দরজা ভেঙে ফেলার জোগাড়, কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা ঘুম জড়ানো চিকন গলা শোনা গেল ভেতর থেকে:

'কে?'

'আমি, টড,' বলল নেলি, উদ্বিগ্ন চোখে একবার রানাকে দেখল। 'আমি, নেলি।'

ক্লিক করে আওয়াজ হলো তালা খোলার, দরজা খুলে যাচ্ছে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে নেলিকে ঠেলে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা।

টডের পরনে শুধু পায়জামা, লম্বা চুলগুলো এলোমেলো, কোঁকড়া, রুক্ষ। পুরুষালী চেহারা, সুদর্শন। নিষ্ঠুরতার ছাপ চেহারায়। লম্বায় রানার সমানই হবে, তবে রুগ্ন।

'কি ব্যাপার?' চড়া গলায় জানতে চাইল সে, কড়া চোখে তাকাল নেলির

দিকে।

'আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে,' রানাকে ইশারায় দেখিয়ে নালিশের সুরে বলল নেলি। বয় ফ্রেন্ডের উপস্থিতিতে হঠাৎ করেই সাহস ফিরে পেয়েছে, ভাবছে আগন্তুকের কাছ থেকে আর কোনও বিপদের ভয় নেই তার।

থমথমে মুখে রানাকে দেখল টড. চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে, তবে রাত্রি জাগরণের প্রভাব কাটিয়ে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠছে দ্রুত।

'কি?' আবার জিজ্ঞেস করল টড। 'এই লোকটা কে?'

'প্রশ্ন যা করার আমি করব, টড,' শান্ত স্বরে জানাল রানা।

'দূর হও!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'কে তুমি!'

'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও, চলে যাব আমি,' আরও শান্ত শোনাল রানার কণ্ঠ। 'কোনও চালাকি করতে যেয়ো না, বিপদ হবে।'

'টড, আমি বলেছিলাম তুমি রেগে যাবে ঘুম থেকে ওঠালে,' বলল নেলি, 'এই লোক আমাকে জোর করে ধরে এনেছে।'

এক নজরে ঘরের ভেতরটা দেখে নিল রানা। ঘরের প্রায় পুরোটাই জুড়ে আছে একটা ডবল-বেড খাট। এক পাশে একটা ড্রেসার। সেটার ওপর একটা পর্সেলিন ডিশ। পাশে একটা এইল-এর খালি বোতল আর পানি ভরা জগ। ড্রেসারের পাশে রাখা কাঠের পিঠ সোজা চেয়ারে সাবধানে নিজের পোশাক ভাঁজ করে রেখেছে টড রলিন্স।

'কাল রাতে নেলির সঙ্গে যাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে তারা কারা?'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল টড। চোখ সরু হয়ে গেছে। দৃষ্টিতে বিষ ঝরছে। পিছিয়ে গেল লোকটা, ওপরের ঠোঁট সরে যাওয়ায় এবড়োখেবড়ো হলুদ দাঁতের সারি বেরিয়ে এসেছে। 'বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে তিন সেকেন্ড সময় দিচ্ছি।' ড্রেসারের কাছে চলে গেছে সে। পর্সেলিনের ডিশটা তুলে নিল হাতে।

এত দ্রুত ডিশটা ফ্রিসবির মত ওর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল টড যে সতর্ক থাকার পরও চমকে গেল রানা। দেখল নিখুঁত লক্ষ্যে বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসছে ভারী বাসনটা। সময় মত কুঁজো হলো রানা, ওর মাথা ছুঁয়ে দরজায় বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে ভাঙল ডিশ। রানাকে সোজা হবার সুযোগ দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই টডের, ডিশ ছুঁড়েই লাফ দিয়ে এগিয়েছে সে জাগুয়ারের ক্ষিপ্রতায়। ডিশ ছুঁড়ে আরেকটু হলেই কাঙ্ক্ষিত ফল পেত সে, কিন্তু লাফ দিয়ে ভুল করে ফেলল। ততক্ষণে সামলে নিয়েছে রানা, কুঁজো হয়ে আছে দেখে টড মনে করেছিল বাগে পেয়ে গেছে শত্রুকে, কিন্তু সোজা হয়েই ধাঁই করে ডান হাতি একটা ঘুসি লাগিয়ে দিল রানা উড়ন্ত টডের চোয়ালে। কড়াৎ করে আওয়াজ হলো চোয়ালের হাড়ে, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা 'বাবারে' বলে। মাটিতে পড়ে

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আবার, বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গড়ান দিয়ে চলে গেল ওপারে। ড্রেসারের ড্রয়ার টান দিয়ে খুলেই হাতে তুলে নিল চকচকে একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা। দু'চোখ জ্বল-জ্বল করছে নগ্ন ঘৃণায়। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে কুকুরের মত। ছোরা হাতে এগোল রানার দিকে। ছোরা ধরার ভঙ্গিই বলে দিল ছোরাবাজিতে দক্ষ লোক সে। বুঝতে পারছে রানা, যাদের সঙ্গে ওর মোলাকাত হয়েছে তাদের ভাল করেই চেনে টড, সে নিজেও সম্ভবত মোসাদের এজেন্ট।

নেলি ঘরের এককোণে সরে দাঁড়িয়েছে। একটা চোখ তার ওপর রাখল রানা, আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে। এক ঝটকায় শোল্ডার হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করে হুমকি দিল, 'সাবধান, টড, ছোরা ফেলে দাও। আর এক পা-ও এগোবে না। প্রথমে আমি হাতে আর পায়ে গুলি করব। মুখ খুলতেই হবে তোমাকে, তার আগে ছাড়ব না।'

থমকে দাঁড়াল টড। একবার ছোরা আরেকবার পিস্তলটার দিকে তাকাল। ছোরা ছুঁড়তে হলে হাত পেছনে নিতে হবে তাকে, বুঝতে পারছে সেটা সম্ভব নয়, তার আগেই গুলি করবে রানা। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল টড, মুখে ফুটে উঠল তিক্ত হাসি।

'না, মিস্টার, আমাকে ইন্টারোগেট করার সুযোগ তোমার হবে না,' বলল নিস্তেজ গলায়। 'আর ঠেকানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক আছে, আগামী টার্গেটের নাম বলে দিচ্ছি–ডক্টর ইব্রাহিম–পারলে ঠেকাও গিয়ে।' জিভ দিয়ে গালের পাশে কি যেন করল, একদিকের গাল ফুলে গেল। চিবুচ্ছে কি যেন। কট্ করে একটা আওয়াজ হলো।

লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল রানা, লাথি দিয়ে টডের হাত থেকে ছোরাটা ফেলে দিয়ে তার গলা চেপে ধরল যাতে ঢোক গিলতে না পারে।

হয়ে গেছে। রানার গায়ে ঢলে পড়ল টড রলিন্স। চোখ উল্টে সাদা অংশ বেরিয়ে গেল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল চোখ দুটো। দেহটা একবার ঝাঁকুনি খেয়েই স্থির হয়ে গেল। দাঁতে চেপে একটা সায়ানাইড ক্যাপসুল ছিল, সেটা দাঁতে চেপে ভেঙে ফেলেছে লোকটা।

রানা ছেড়ে দিতেই ধপ করে মেঝেতে পড়ল লাশ।

ঘরের কোণে এখনও দাঁড়িয়ে আছে নেলি, এবার তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করল। বুঝতে পেরেছে, মারা গেছে টড।

টড রলিন্স পেশাদার গুপ্তচর, মুখ খোলার চেয়ে মৃত্যুকেই বেশি কাম্য মনে করেছে।

গালে এক চড় কষিয়ে নেলিকে থামিয়ে দিল রানা। মেয়েটাকে বিছানায় বসতে বাধ্য করে ঘরটা সার্চ করতে শুরু করল। কিন্তু পাওয়া গেল না কিছুই।

ঘরে কোনও লিসেনিং ডিভাইস বা ওয়্যারলেস সেট নেই। ড্রেসারের ড্রয়ারে রাখা সমস্ত কাগজ ঘেঁটে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পেল না রানা।

এখানে আর কিছু করার নেই। নেলির দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, শুনতে পেল তীক্ষ্ণ চিৎকার। আবার চেঁচাতে শুরু করেছে নেলি। এককেবারে সিঁড়ির তিন ধাপ করে নামছে এখন রানা, অস্টিনের চাবিটা ওর কাছেই আছে, নেলি যত খুশি চিৎকার করুক, পুলিস এসে যা খুশি জানতে চাক, ওর কিছু যাবে আসবে না। হোটেলে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ওর, নেলির কাছ থেকে কিছু জানলেও ওকে খুঁজে পাবে না পুলিস।

বেবি অস্টিন স্টার্ট দিয়ে মেইন রোডে চলে এল রানা, গাড়িটা এক জায়গায় পার্ক করে একটা ট্যাক্সি ধরে ফিরে এল হিলটনে। একটু পরই চেক আউট করল, আধঘণ্টা পর পৌঁছে গেল রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউসে।

মেজাজটা খিঁচড়ে আছে, এতকিছু ঘটল অথচ একটা নাম ছাড়া আর কিছুই নেই ওর হাতে। অন্ধকার ঘরে অন্ধের মত লাগছে নিজেকে। বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে আরও তথ্য জানতে চেয়ে সাহস করে ডক্টর ইব্রাহিমের নাম সহ একটা কোডেড মেসেজ পাঠাল বিসিআইতে। এখন অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর। শাওয়ার শেভ সেরে ছয় ঘণ্টার টানা একটা ঘুম দিয়ে উঠল।

*

আট ঘণ্টা পর ডিপ্লোমেটিক ব্যাগটা পৌঁছে দিল রানা এজেন্সির লন্ডন চীফ, হাসান।

একগাদা কাগজ ফোল্ডারে।

নিউরোলজিকাল রিপোর্ট বলছে রহস্যময় কোনও কারণে বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মেডিক্যাল সায়েন্সে এমনটা আগে আর কখনও দেখা যায়নি। নিউরোলজিস্ট আর সাইকিয়াট্রিস্টরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এমনটা হবার কোনও কারণ খুঁজে পাননি। কনজেনিয়াল রিটার্ডেশন অথবা ম্যাসিভ ব্রেইন ড্যামেজে যেমন দেখা যায়, সেটাই ঘটেছে বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে। কিন্তু ব্রেইনে ড্যামেজের কোন চিহ্ন নেই!

দুটো মাত্র ব্যাখ্যা তাঁরা দাঁড় করাতে পেরেছেন। প্রচণ্ড শক্তিশালী ইলেক্ট্রিকাল রে যদি এক্স রে-এর মত ক্ষতিকর হয় তাহলে ব্রেইনের এমন অবস্থা করতে পারে। আবার কোনও অজানা ভাইরাসের কাজও হতে পারে এটা।

যেহেতু সায়েন্টিস্টদের মীটিঙের পরই এমনটা ঘটছে কাজেই ধরে নেয়া চলে যে সবার সামনেই কৌশলে সারা হচ্ছে কাজটা সম্ভবত ভাইরাসই ব্যবহার করা হচ্ছে।

আক্রান্ত বিজ্ঞানীদের নামগুলো আবারও উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। বলা

হয়েছে শুধু মুসলিম বিজ্ঞানীরা আক্রান্ত হচ্ছেন।

ডক্টর রাশেদ মিলিটারি হার্ডওয়্যারে ইলেকট্রনিক উইপন ডেভেলপ করেছিলেন। ডক্টর আহ্সান যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের দ্রুত চিকিৎসা এবং আরোগ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। আল হামিদ কাজ করছিলেন নতুন মলিকিউলার থিয়োরি নিয়ে। মোটমাট সাতজন বিজ্ঞানীর সর্বনাশ হয়েছে। প্রত্যেকেই এঁরা বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

স্পেস বায়োলজি নিয়ে কাজ করছেন ডক্টর ইব্রাহিম, গবেষণায় সফলতা পাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। তাঁর গবেষণা সফল হলে পশ্চিমা বিশ্বের চেয়ে স্পেস বায়োলজিতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ ও কুয়েত সহ আরও কয়েকটা মুসলিম দেশ।

বিশেষ করে বলা হয়েছে, কুয়েত এবং সৌদি আরবের কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে বাংলাদেশ বাঙালী বিজ্ঞানীদের অবদানের কারণে।

ছোট একটা চিঠিও দিয়েছেন রাহাত খান। দ্রুত চোখ বোলাল রানা।

'রানা,

ওরা আমাদের সেরা বিজ্ঞানীদের শেষ করে দিচ্ছে। গোটা জাতির সম্পদ তাঁরা, অথচ তাঁদের আমরা রক্ষা করতে পারছি না। ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়াও এমুহূর্তে সম্ভব নয়। ইটালিয়ান রিভিয়েরাতে আগামী কয়েকদিন পর আইএসএস মীটিং, আমি চাই তুমি নিজে ডক্টর ইব্রাহিমের নিরাপত্তার দায়িত্ব নাও। পরবর্তী নির্দেশ শীঘ্রি পেয়ে যাবে। তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে ডক্টর ইব্রাহিমের কোনও ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট সময় মত পৌঁছোবে।'

বুড়ো নির্দেশ দিয়েই খালাস, রাহাত খানের অনুকরণে ভ্রূ কুঁচকে ভাবল রানা, কিভাবে ভাইরাস বা ইলেকট্রিক রে থেকে বিজ্ঞানীকে ও রক্ষা করবে সে-ব্যাপারে কিছুই লেখেনি বুড়ো। কট্টর বুড়ো পাহারাদারের দায়িত্ব দিয়েছে ওকে, আশা করছে রহস্যটা সমাধান করতে পারবে ও, মোসাদের বদমায়েশী রুখে দিতে পারবে। অথচ সূত্র বলতে কিছুই নেই হাতে।

পাঁচ

অ্যালিটালিয়ার ফ্লাইটে মিলান পৌঁছোল রানা, একটা রেন্ট-আ-কার নিয়ে চলে এল জেনোয়ায়। ওখানে থামল না, আরও দক্ষিণে পোর্টোফাইনো, সেখানে চলেছে।

হোটেল এক্সেলশিয়ারে আইএসএস মীটিং অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে ডক্টর ইব্রাহিমের পাশের স্যুইট ওর জন্য বুক করা হয়েছে। দুটো ঘরের চাবিই রানার কাছে থাকবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে ঠিক হয়েছে যে পোর্টোফাইনোর বাইরে একটা সার্ভিস স্টেশনে ডক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ওর। রোম থেকে ড্রাইভ করে আসছেন বিজ্ঞানী। বিসিআই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্রিফ করেছে। ডক্টর ইব্রাহিম কথা দিয়েছেন রানার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। গাড়িটা পোর্টোফাইনোর একটা পার্কিং লটে রেখে পুরোনো একটা ট্যাক্সি চেপে সার্ভিস স্টেশনে হাজির হলো রানা।

ডক্টর ইব্রাহিম আগেই উপস্থিত হয়েছেন, ছোট্ট ফিয়াট এইট-ফিফটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সার্ভিস স্টেশনের ছাউনির নিচে।

বেঁটেখাটো হাসিখুশি বৃদ্ধ, মাথা জোড়া চকচকে টাক। গোল একটা ভুঁড়ি আছে, নিঃসন্দেহে খাদ্যরসিক। পেটে হাত বুলিয়ে জানালেন বউয়ের হাতের সুস্বাদু প্যাস্তা খেয়ে মোটা হয়েছেন। প্রথম পরিচয়ে পছন্দ করার মত মানুষ। সঙ্গে করে বউ আর বউয়ের বোনঝিকেও নিয়ে এসেছেন। তিনি যখন মীটিঙে ব্যস্ত থাকবেন, রিভিয়েরায় ছুটি কাটাবে ওরা। এখন তারা সার্ভিস স্টেশনের ওয়াশরুমে গেছে, এক্ষুণি ফিরবে।

'আমাকে বলা হয়েছে আপনার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে,' রানাকে বললেন ডক্টর। 'রীতিমত নির্দেশ দিয়েছেন রাহাত খান, আপনার কথার বাইরে যাতে এক পা-ও না ফেলি।'

হাসল রানা। একেবারে বাচ্চাদের মত করে কথাগুলো বলছেন ডক্টর, তবে তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো বলে দিচ্ছে কপালের পেছনে দ্রুতগতিতে চলমান একটা মগজ কাজ করছে।

মিসেস ইব্রাহিম নিঃসন্তান ইটালিয়ান মহিলা। বেঁটে, মোটা, প্রৌঢ়া; কমনীয় চেহারা।

'এই যে, সেনিয়র রানা,' পরিচয় করিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী। 'এঁর কথাই

বলেছিলাম, আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন অবসর কাটাবেন।'

'আহ্, সি,' বললেন মিসেস ইব্রাহিম, 'যাঁর কথা শুনে চলতে হবে তোমাকে?' রানাকে আপাদমস্তক দেখলেন বিচারকের দৃষ্টিতে। হাসলেন তারপর, বললেন, 'আশা করি চল্লিশ বছরে আমি যা পারিনি তা আপনি পারবেন, সেনিয়র রানা।'

'পারবে,' রানা কিছু বলার আগেই বললেন বিজ্ঞানী। 'ও আকারে তোমার চেয়ে ঢের বড়।'

সেনিয়রা ইব্রাহিমের পেছনে যে মেয়েটা আসছে তাকে দেখে অজান্তেই চোখ বিস্ফারিত হলো রানার। এক পলকই যথেষ্ট। সুন্দরী বললে এ-মেয়েকে রীতিমত অপমান করা হয়। রূপের একটা আগুন, সূর্য কিরণের মত জ্বলজ্বল করছে। নিখুঁত গোল মুখটাকে ঘিরে রেখেছে কালো চুল, কাঁধে লুটিয়ে আছে। ধনুকের মত ভ্রূ। সুগঠিত ঠোঁট দুটো রসাল, ঈষৎ ফাঁক করা প্রস্ফুটিত গোলাপ, কাছে আসতে আহ্বান করছে যেন। পরিপূর্ণ দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে। বুকের কাছে উঁচু হয়ে আছে ব্লাউজ, দুধসাদা দু'স্তনের অর্ধেকটা করে দেখা যাচ্ছে। চওড়া ঊরু, সরু কোমর। আঁটো পোশাকে দেহের প্রতিটা খাঁজ-ভাঁজ নারীত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত। রানাকে দেখে ওরও কালো চোখ দুটো একটু বড় হলো। নিজেকে রানার মনে হলো স্কুলের ছাত্র, তীব্র আকর্ষণ বোধ করায় হঠাৎ করে চমকে গেছে। অপূর্ব রূপসী এক নারী, রীতিমত জীবন্ত একটা কাব্য। বায়রনের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল: ইটালিয়ান মেয়েরা তাদের হৃদয়ের কথা ঠোঁটে প্রকাশ করে। চোখের সামনে যেন জ্বলন্ত একটা আগ্নেয়গিরি।

মাত্র এক পলক, তারপরই নিজেকে সামলে নিল রানা।

'ও অ্যাঞ্জেলিয়া, আমার সবচেয়ে আদরের ভাগ্নী,' বললেন প্রফেসর। 'আর ইনি সেনিয়র রানা। আমাদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটাবেন।'

হাত মেলাল অ্যাঞ্জেলিয়া রানার সঙ্গে। যতক্ষণ ভদ্রতা, তার চেয়ে ছোঁয়াছুঁয়িটা দু'পক্ষ থেকেই একটু বেশি সময় নিল। মেয়েটার চোখে প্রশংসার ছাপ চিনতে ভুল হলো না রানার। মনে মনে নিজেকে শাসাল ও: তুমি জটিল একটা অ্যাসাইনমেন্টে এখানে এসেছ। সাবধান, রানা, কর্তব্যে যেন কোন অবহেলা না হয়। খবরদার!

গাড়ির সামনের সীটে বিজ্ঞানীর পাশে বসলেন মিসেস, রানার স্থান হলো পেছনের সীটে, অ্যাঞ্জেলিয়ার পাশে। ছোট গাড়ি, একটু পর পর অ্যাঞ্জেলিয়ার ঊরু ঊরুর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাচ্ছে। রানার মনে হলো ইউরোপিয়ান ছোট গাড়ির এই বিশেষ সুবিধেটা গাড়ি কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন করা উচিত।

দু'পাশে সবুজ মাঠ, ফসলের খেত আর একটু পর পর ছবি মত সুন্দর ফার্ম হাউস। মসৃণ রাস্তা পেয়ে বেশ দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছেন বিজ্ঞানী। দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে

দৃশ্যপট। একটু পরেই সাগরের তীরে চলে এলো ওরা।

'আশা করি অ্যাঞ্জেলিয়া সঙ্গে আসায় আপনি অসন্তুষ্ট হননি, মিস্টার রানা,' বললেন প্রফেসর। 'ও আসতে চায়নি, কিন্তু আমরা ভাবলাম একা ওকে রোমে রেখে আসা ঠিক হবে না। ক্যালাব্রিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে থাকে ও, আমরা আসছি জেনে ছুটি কাটাতে এসেছে। আমরা, আমি আর আমার স্ত্রী, বিরক্তিকর প্রাণী হলেও, বছরে দু'বার আমাদের সঙ্গে ছুটি কাটায় অ্যাঞ্জেলিয়া।'

দ্রুত ইটালিয়ান ভাষায় প্রতিবাদ করল অ্যাঞ্জেলিয়া। 'তোমরা বিরক্তিকর নও, আঙ্কল! তুমি ভাল করেই জানো আন্ট তেরেসা আর তোমার সঙ্গে ছুটি কাটাতে আমার ভাল লাগে। তবে তোমাদের ওই নীরস মীটিং আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

'মীটিং ইটালিয়ান রিভিয়েরাতে হলেও নয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রিভিয়েরাতে হলেও নয়,' রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ অ্যাঞ্জেলিয়া, তারপর বলল, 'তবে এবারের ছুটিটা সম্ভবত অন্যরকম কাটবে।'

মেয়েটা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে বুঝতে দেরি হলো না রানার, চুপ করে থাকল ও। শীঘ্রি এ মেয়ে বুঝে যাবে যে ও সময় দিতে পারবে না। অ্যাঞ্জেলিয়ার বিজ্ঞানী খালুর চেয়ে অনেক ব্যস্ত সময় কাটাতে হবে ওকে।

ক্যালাব্রিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলটা এখনও প্রায় বুনো। পুরোনো আমলের ভাবধারা চলে ওখানে। তীব্র ভালবাসা আর নগ্ন ঘৃণার সরাসরি প্রকাশ ঘটে আজও। মেয়েটা সেজন্যেই রাখঢাক শেখেনি। তবে রানার ধারণা হলো, মোটামুটি লেখাপড়া করেছে অ্যাঞ্জেলিয়া, জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের সুযোগ-সুবিধে সম্বন্ধে সচেতনতা এসেছে, ফলে বেড়ে গেছে চাহিদাও।

পোর্টোফাইনোতে দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল ওরা। পথে বিজ্ঞানীকে খুলে বলল রানা কি কি নিয়ম তাঁকে পালন করে চলতে হবে। সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কঠোর। বাংলাদেশ থেকে মিনারেল ওয়াটার পাঠানো হয়েছে, বোতলগুলো থেকে পানি খেতে হবে ডক্টর ইব্রাহিমকে। একা কোনও খাবার খাওয়া চলবে না। বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে লাঞ্চ অথবা ডিনারে বসলে অবশ্য তাঁকে বারণ করা হয়নি। কোনও রকমের কোনও পিল খাওয়া যাবে না। রানাকে ছাড়া একা কোথাও যাওয়া চলবে না, রানা উপস্থিত না থাকলে কারও সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ। তবে এ নিয়ম রানা কিছুটা শিথিল করল। মিসেস ইব্রাহিম স্বামীর সঙ্গে একা থাকতে পারবেন। চোখ পিটপিট করে ধন্যবাদ দিলেন ডক্টর ইব্রাহিম। মুহূর্তের জন্যে তাঁকে মনে হলো বাধ্য স্কুল-ছাত্র।

হোটেলে চেক ইন করার পর বিজ্ঞানীর লিভিং রূম, বেড রূম আর বারান্দার দরজা-জানালাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল রানা, প্রত্যেকটা তালা খুলে বন্ধ করে সন্তুষ্ট হলো।

বিকেলে সেমিনার শুরু হবে। বিশ্রাম নিতে চাইলেন ডক্টর ইব্রাহিম, কাজেই দুটো ঘরের মাঝখানের দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে এল রানা, সুটকেস খুলে কাপড়চোপড় বের করল।

বিশ মিনিট পর দরজায় নক হলো। দরজা খুলে রানা দেখল অ্যাঞ্জেলিয়া দাঁড়িয়ে আছে, পরনে বিকিনি। কোমরে তোয়ালে বেঁধেছে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডোরাকাটা টাইট প্যান্টি।

'আমি বীচে যাচ্ছি,' বলল অ্যাঞ্জেলিয়া। সুরটা আমন্ত্রণের।

'আমি যাব না,' বলল রানা। দেখল মেয়েটার দু'চোখে নিখাদ বিস্ময় ফুটে উঠেছে, চেহারা দেখে মনে হলো রানা হুঁশে নেই বলে মনে করছে। রানারও মনে হলো ওর মাথায় নির্ঘাত গণ্ডগোল আছে।

'কিন্তু এটাই তো সানবাথের আদর্শ জায়গা,' বিস্ময় কাটিয়ে বলল অ্যাঞ্জেলিয়া, 'এখনই তো সময়। আবহাওয়াও চমৎকার।...তবে তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে না চাও তাহলে ঠিক আছে, আমি একাই যাব।' ঠোঁট ফুলিয়ে রেখেছে অ্যাঞ্জেলিয়া, চেহারায় অভিমান।

যত ভঙ্গিই নাও, আমি যাচ্ছি না, মনে-মনে বলল রানা। 'তুমি ভাল করেই জানো, অ্যাঞ্জেলিয়া, যে তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু একটা কাজে এসেছি আমি এখানে। সে কাজে কোন গাফিলতি যাতে না হয় সেটা দেখা আমার কর্তব্য। সময় বের করতে পারলে আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গে যেতাম।'

অ্যাঞ্জেলিয়ার মায়াময় চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো কট্টর বুড়োও যৌবনে একে সামনে দেখলে বোধহয় কর্তব্য ভুলে পেছনে ছুটত। এক সেকেন্ড পর বুঝতে পারল, ওর ধারণা সঠিক হতে পারে না। বুড়ো সাধে কট্টর বুড়ো হয়নি। আগে কাজ, পরে অবসর বিনোদন।

'ঠিক আছে,' হতাশ স্বরে বলল অ্যাঞ্জেলিয়া, 'খালুকে কি বলেছ শুনেছি আমি। পরে হয়তো তোমার সময় হবে। তখন একসঙ্গে ঘুরতে বের হব আমরা। তোমার মত একজন পুরুষ কাছেপিঠে থাকতে পোর্টোফাইনোতে একা সময় কাটানো সত্যি দুঃখজনক ঘটনা হবে। না, ঠিক বলিনি, রীতিমত পাপ হবে।'

'তাই?' মেয়েটার সরলতায় একটু বিস্মিত হয়ে বলল রানা। 'দেখি সময় করতে পারি কিনা। পারলে বিরক্ত করে মারব তোমাকে।'

ঘুরে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলিয়া, ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল। দু'চোখ বলে দিল, রানা, সময় বের করে নাও, এমন সুযোগ জীবনে আর না-ও আসতে পারে। মেয়েটাকে হলরুম ধরে হেঁটে যেতে দেখল রানা। প্রতিটা পদক্ষেপে দুলছে কোমর, ভারী নিতম্বে সুললিত সঙ্গীতের ছন্দ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরে এলো রানা।

সন্ধের আগে পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটল, তিনটে সেমিনারে ডক্টর ইব্রাহিমের সঙ্গে থাকতে হলো রানাকে। ইন্টার‍্যাকশন অভ এনযাইম ইন গ্লোবুলার ডিস্টার্ব্যান্সেস থেকে শুরু করে রিপ্রোডাকশন স্টাডিয অভ দ্য হাইড্রয়েড্স্ রানার একান দিয়ে ঢুকে ওকান দিয়ে বের হলো। যৌন বিষয় যে এতটা আকর্ষণহীন হতে পারে এ ব্যাপারে আগে ওর কোনও ধারণাই ছিল না। সেমিনারে প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচয় হলো। চারজন নরওয়েইজিয়ান, দু'জন ফ্রেঞ্চ, তিনজন জার্মান, চারজন রাশান, তিন চাইনিজ, চার আমেরিকান ছাড়াও ডক্টর ইব্রাহিমকে নিয়ে আরও আছে নানা দেশের সতেরোজন বিজ্ঞানী। সেমিনারে ডক্টর কার্ল ক্রিসের সঙ্গেও পরিচয় হলো। গম্ভীর, ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা মানুষটার, লম্বা-চওড়া ব্যায়াম করা শরীর। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। সর্বক্ষণ চঞ্চল দু'চোখে ছোরার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

'ডক্টর কার্ল ক্রিস আমাদের সবচেয়ে দামী মানুষ,' পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বললেন ডক্টর ইব্রাহিম। 'কার্ল আইএসএস-এর সেক্রেটারি, নিজেও মস্ত বড় বিজ্ঞানী। একমাস পরপর আমাদের সবার মীটিঙের ব্যবস্থা করা ওঁরই দায়িত্ব। কোথায় মীটিং হবে, কোথায় থাকার ব্যবস্থা, সেমিনার কয়টা হবে, কে কে বক্তৃতা দেবে, কি বিষয়ে বক্তৃতা দেবে সেটা সবাইকে জানানো–সব উনিই পরিচালনা করেন।'

ডক্টর ইব্রাহিমের কাঁধে হাত রেখে রানাকে দ্রুত পর্যবেক্ষণ করলেন কার্ল ক্রিস তীক্ষ্ণ চোখে। এক পলকে রানার ওজন মেপে নিলেন যেন। শান্ত গলায় বললেন, 'জানি আপনার জন্যে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, মিস্টার রানা। তবে যেকোনও প্রয়োজনে আমাকে ডাকতে দ্বিধা করবেন না।'

কার্ল ক্রিসের কণ্ঠে সামান্য টানটুকু খেয়াল করল রানা। মানুষটা তিনি সুইস। ব্যস্ত মানুষ, রানার উদ্দেশে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন। বারবার থামছেন তিনি, ভদ্রতাসূচক হাসি মুখে ধরে রেখে এর ওর সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন। রাতে খাবার সময় তাঁকে আরও ব্যস্ত দেখল রানা, দক্ষতার সঙ্গে তদারক করছেন সবকিছু। ডিনারের পুরোটা সময় একবারের জন্যেও ডক্টর ইব্রাহিমকে ছেড়ে গেল না ও। সতর্ক চোখে দেখল প্রফেসর কি খাচ্ছেন বা পান করছেন। ডিনার শেষ হতে রানার পাশে এসে দাঁড়ালেন কার্ল ক্রিস।

'মীটিং কি সব সময়ে এত সুশৃঙ্খল ভাবেই হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি বলতে চাইছেন এত খারাপ ভাবে সবকিছু ম্যানেজ করি কিনা?' মৃদু হাসলেন ডক্টর ক্রিস।

রানাও ঠোঁট প্রসারিত করল। ভদ্রলোক ওর মুখে কি শুনতে চান বুঝতে পারছে। বলল, 'আমি জানতে চাইছিলাম এত চমৎকার ভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়

সবসময়?'

'চেষ্টা করি সাধ্যমত, অ্যারেঞ্জমেন্ট কেমন হয় তা বলতে পারবেন অভ্যাগতরা,' বিনয় করে বললেন আইএসএস সেক্রেটারি। 'সেমিনারের পর জেনারেল সেশন হয়, এছাড়া আছে লাঞ্চ-ডিনারের ব্যবস্থা। দ্বিতীয়দিন মেইন সেশন। সেদিন একজনকে স্পীকার নির্বাচন করা হয়। শেষের দিনটা রাখা থাকে বিশ্রাম আর আনন্দের জন্যে। পরশুদিন আমরা সবাই বীচে কাটাব। যত প্রতিভাবানই হোন না কেন বিজ্ঞানীরা, কাঁকড়ার মতই সূর্য আর সৈকত ভালবাসেন সবাই।' আবার হাসলেন ক্রিস, রানার কাঁধে হালকা একটা চাপড় মেরে অন্যদিকে চলে গেলেন।

ঘরে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ক্লান্ত প্রফেসর। তাঁকে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হলো রানা।

'আমি খুব ক্লান্ত,' ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন প্রফেসর। 'তবে আপনার কথা ভেবে খারাপ লাগছে আমার, এই যে রিভিয়েরায় এলেন, অথচ রিসোর্টে রাতের লাইফটা এঞ্জয় করতে পারলেন না, এটা একটা বাজে ব্যাপার হলো। আমি দরজায় তালা দেয়ার পর ইচ্ছে করলে আপনি ঘুরতে বেরোতে পারেন।'

'পাশের ঘরেই থাকব আমি,' বলল রানা, 'কোনও দরকার হলে দেরি না করে ডাক দেবেন।'

নক করতেই দরজা খুললেন মিসেস ইব্রাহিম। রানা দেখল সিল্কের চকচকে লাউঞ্জিং রোব পরে একটা চেয়ারে বসে আছে অ্যাঞ্জেলিয়া, হাতে সিনে ম্যাগাজিন। রানাকে দেখে নিচের ঠোঁটটা অভিমানে একটু ফুলে উঠল।

হঠাৎ করে চিন্তাটা মাথায় খেলল রানার। আগে কথাটা জানা হয়নি। বলল, 'অ্যাঞ্জেলিয়ার এঘরে শোয়ার অনুমতি নেই। ওর জন্যে নিশ্চয়ই আলাদা ঘর নেয়া হয়েছে?'

'পাশের স্যুইটে থাকছে ও।' বিস্মিত দেখাল মিসেস ইব্রাহিমকে। 'আমরা তো ভেবেছিলাম অ্যাঞ্জেলিয়া আপনার সন্দেহের বাইরে। ও থাকলে কি অসুবিধে হতো, মিস্টার রানা?'

কঠোর দেখাল রানার মুখটা। 'অনুমতি নেই থাকার। আমি দুঃখিত, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই অ্যাঞ্জেলিয়া এঘরে থাকতে পারে না। আমি না থাকলে প্রফেসর একা শুধু আপনার সঙ্গেই থাকতে পারবেন।'

ঠোঁট আরও ফুলিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলিয়া, চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। 'আপনি আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন, মিস্টার রানা? ব্যাপারটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'সন্দেহ যেমন করছি না, তেমনি সন্দেহের উর্ধ্বেও রাখছি না,' বলল রানা।

আচরণে মনে হয় খালুকে খুব পছন্দ করে অ্যাঞ্জেলিয়া, কিন্তু সেজন্যে কোনও ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আগেও অন্তরঙ্গ অনেককে পিঠে ছুরি বসাতে দেখেছে ও। ব্যক্তিগত ভাবে অ্যাঞ্জেলিয়াকে ও বিশ্বাস করতে রাজি, কিন্তু অফিশিয়ালি পোর্টোফাইনোর আর সবার মত অ্যাঞ্জেলিয়াও সন্দেহভাজন।

রাগী চেহারায় তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। রানা হাসি হাসি মুখে বলল, 'পাশের স্যুইটে থাকছে যখন তাহলে তো কোনও সমস্যা নেই। নাহলে ডক্টর ক্রিস্‌কে বলে অন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে হতো আমাকে।' অ্যাঞ্জেলিয়ার দিকে তাকাল। 'কিছু মনে করবেন না, এবার নিজের ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। কালকে ব্যস্ত একটা দিন কাটবে প্রফেসরের। তাঁর বিশ্রাম দরকার। আমারও।'

কড়া চোখে রানাকে দেখে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল অ্যাঞ্জেলিয়া।

বিসিআইয়ের একটা ইলেকট্রিকাল ডিভাইস দরজায় সেট করল রানা। নীরব অ্যালার্ম ওটা। দরজার তালা খোলার চেষ্টা হলে রানার ঘরে একটা রেডিয়ো সিগন্যাল পাঠাবে লাইভ অ্যালার্মে, সশব্দে বেজে উঠবে ওর ঘরে রাখা অ্যালার্মটা। জানালাগুলো আরেকবার পরীক্ষা করে দেখল, সবগুলোয় ছিটকিনি আটকানো আছে। নিজের ঘরে চলে এল ও, মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মাঝরাত, দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হলো। ঘুমায়নি এখনও রানা, আন্দাজ করতে পারছে কে হতে পারে। তবে সতর্কতায় কোনও ঢিল দিল না, ওয়ালথারটা হাতে নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নব ঘোরাল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যাঞ্জেলিয়া, পরনে স্বচ্ছ একটা নাইটগাউন। রানাকে দেখে হাসল। 'এখনও হাতে পিস্তল? এত রাতে কে আসবে?'

জবাবে হাসল রানা, কিছু বলল না।

'ভেতরে আসতে বলবে না আমাকে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'এসো।' দরজা থেকে সরল রানা।

আয়েসী একটা বেড়ালের মত সোফায় বসে ওর দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলিয়া।

'একটা ড্রিঙ্ক হবে?' জানতে চাইল।

'বুরবঁ দেব? আগে খেয়েছ কখনও?'

মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলিয়া। দুটো গ্লাসে বুরবঁর সঙ্গে সামান্য পরিমাণ পানি ঢেলে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল রানা মেয়েটার হাতে।

প্রথমে ছোট্ট করে চুমুক দিল অ্যাঞ্জেলিয়া, তারপর এক চুমুকে শেষ করে ফেলল বাকিটা। মুখের সামনে তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'বুরবঁ ঠিক তোমার মত। শক্তিশালী, কড়া অথচ চমৎকার।'

জবাব দিল না রানা। নিজের গ্লাসটা শেষ করে বলল, 'এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

কিছুক্ষণ রানার চোখে চোখে চেয়ে থাকল অ্যাঞ্জেলিয়া, তারপর শ্রাগ করে সোফা ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়াল রানার সামনে, মুখটা উঁচু করে রেখেছে। ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে ভেজা দু'ঠোঁট।

'দুঃখিত, অ্যাঞ্জেলিয়া,' বলল রানা। 'একটা দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি আমি, তোমাকে সঙ্গ দিতে পারছি না সেজন্যে। যদি কর্তব্য পালন করতে না পারি তাহলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না। পরে যদি কখনও সময় পাই তাহলে দেখবে আমাকে পাশ থেকে খসাতে পারছ না।' একটু থামল ও, তারপর বলল, 'তুমি হয়তো একদিন আমাদের সবুজ, শ্যামল, সুন্দর দেশে আসবে। আবার এমনও হতে পারে আমিই হয়তো ক্যালিব্রিয়াতে যাব কোনদিন।'

রানার কথা সান্ত্বনা হিসেবে ধরেছে, অপমানে ল্যালচে হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা। ঢোক গিলল। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না রানা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। চোখ দুটো জ্বলছে। 'তুমি কাজটা ভাল করলে না, রানা,' বলল অ্যাঞ্জেলিয়া, 'তুমি আমাকে অপমান করলে, আমার নারীত্বকে অবহেলা করলে।' আস্তে করে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা, ফিরে গেল নিজের স্যুইটে।

এমনটা হোক চায়নি রানা, কিন্তু কিছু করার নেই। একটু পরেই বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ও। কালকে সারাদিন ব্যস্ত সময় কাটাতে হবে। প্রতিটা মুহূর্ত নজর রাখতে হবে চারদিকে সবার ওপর। কখন কিভাবে কোথায় তার ওপর আক্রমণ আসে তা বলা যায় না।

*

ভোরের প্রথম আলো জানালা দিয়ে চোখে এসে পড়ায় ঘুম ভাঙল রানার। দরজায় হালকা টোকার শব্দ।

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল রানা, পোশাক পরতে পরতে এগোল দরজার দিকে।

বহাল তবিয়তে আছেন প্রফেসর। তাঁর ঘরের অ্যালার্ম ডিভাইসটা খুলে নেয়ার পর প্রফেসরকে নিয়ে নিচের লাউঞ্জে ব্রেকফাস্ট করতে নামল রানা। খাবারে যদি কিছু থাকে তো প্রফেসর একা নন, রানার মগজটাও যাবে।

দিনটা কাটল একের পর এক সেমিনার, মীটিং আর নীরস বৈজ্ঞানিক পেপার শুনে। রানার ধারণা হলো বিজ্ঞানীদের দিয়ে জোর করে গল্প লেখানো দরকার। ভয়ঙ্কর কিছু যদি মীটিঙে সত্যিই থাকে তাহলে সে হচ্ছে ওই বৈজ্ঞানিক তথ্য ভরা পেপারগুলো। বিকেলে ডক্টর ক্রিস সবাইকে নিয়ে রিসোর্ট ঘুরিয়ে দেখাতে বের হলেন। প্রফেসরের কাছ থেকে নড়ল না রানা, আর রানার কাছ থেকে নড়ল না অ্যাঞ্জেলিয়া। রাত দশটার সময় মুক্তি মিলল। বিজ্ঞানীকে ঘরে ঢুকিয়ে অ্যালার্ম ডিভাইস সেট করে নিজের ঘরে ফিরল রানা।

যতবার চোখাচোখি হয়েছে একবারও আজ কথা বলেনি অ্যাঞ্জেলিয়া। রাতের প্রত্যাখ্যান ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছে মেয়েটা।

পরের দিনটাই কনফারেন্সের শেষ দিন। ডক্টর ক্রিস বলেছেন এ দিনটা বিশ্রামের দিন। বুফের ব্যবস্থা করবেন তিনি সৈকতে।

সকাল দশটার দিকে সবাইকে নিয়ে সৈকতে হাজির হলেন কার্ল ক্রিস।

নীল সাগরে মৃদু ঢেউ। সৈকতে অনেক মানুষের মেলা। নানা রঙের পোশাক পরেছে তারা। হৈ-হৈ করছে, ছুটোছুটি করছে বাচ্চাদের মতো। বিজ্ঞানীরাও বাদ নেই।

সৈকতে একটা চেয়ারে বসে প্রফেসরের ওপর নজর রাখল রানা। কাছেই একটা চেয়ারে বসে আছেন তিনি, তাই অসুবিধে হলো না কোনও। রানার পাশেই আছে অ্যাঞ্জেলিয়া, এক মুহূর্তের জন্যেও তাকাচ্ছে না। এমনকি রানা যখন সবার জন্যে বুফে থেকে লাঞ্চ আনল তখনও ধন্যবাদ দিল না সে।

বিকেলে ঘুরে ঘুরে সবার কুশল জানতে চাইলেন কার্ল ক্রিস। হাফ-প্যান্ট আর ছিটের শার্টে তাঁকে উচ্ছল যুবক বলে মনে হচ্ছে। প্রফেসর ইব্রাহিমকে চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্য করলেন তিনি, কাঁধে আন্তরিক চাপড় দিয়ে একটা বীচ রোব পরিয়ে দিলেন, রানার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশা করি আমাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত এই সময়টা ভালই কেটেছে আপনার, মিস্টার রানা। যদিও জানি না কেন আপনাদের গভর্নমেন্ট আপনাকে পাঠিয়েছে, তবে ধারণা করছি সেই কারণটা কিছুক্ষণ পরই আর থাকবে না।'

'আমিও তা-ই আশা করছি,' হাসি হাসি মুখ করে বলল রানা। 'তবে সেক্ষেত্রে সম্ভবত আবারও আমাকে আপনাদের মীটিঙে আসতে হবে।'

'আমরা আপনাকে স্বাগত জানাতে তৈরি থাকব,' কার্ল ক্রিসও হাসলেন, রানা আর প্রফেসরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন অন্যদের দিকে।

সবাইকে নিয়ে হোটেলে ফিরল রানা, এক-এক করে প্রফেসরের সমস্ত লাগেজ চেক করল, তারপর নিজে বয়ে তুলে দিল প্রফেসরের ছোট্ট ফিয়াটে। এখান থেকে রোম হয়ে কুয়েতে ফিরবেন প্রফেসর। রানার দায়িত্ব তাঁকে রোম পর্যন্ত নিরাপদে পৌছে দিয়েই শেষ। তবে সেজন্যে শেষ মুহূর্তের সতর্কতায় কোনও ঢিল দিল না ও।

রোমে পৌছে বিদায় নেয়ার পালা। মিসেস ইব্রাহিমের সঙ্গে করমর্দন করল রানা। প্রফেসর ওকে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা জানালেন। চেহারা দেখে রানা বুঝতে পারল, পাহাড়ী প্রত্যন্ত অঞ্চল ক্যালিব্রিয়াতে যেতে মন চাইছে না মেয়েটার, কিন্তু যেতেই হবে। খারাপই লাগল ওর। ছুটি কাটাতে যদি আসত তাহলে সত্যি সময়টা চমৎকার কাটত ওর অ্যাঞ্জেলিয়ার সঙ্গে।

রানা একাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে রোম এয়ারপোর্টে পৌঁছোল, লন্ডনের ফ্লাইট ধরবে। সন্তুষ্ট, সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে। আগের আইএসএস মীটিংগুলোতে যা-ই ঘটে থাকুক, এবার কিছু ঘটেনি। প্রফেসর ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে কোনও প্লট যদি হয়েও থাকে সফল হতে পারেনি প্রতিপক্ষ। রানা বুঝতে পারছে এই মীটিঙে কিছু ঘটেনি বলেই ওর জিত হয়ে গেছে তা নয়। কে দায়ী, আসলে কি ঘটে–কিছুই জানা যায়নি।

এবার কি করবে বুড়ো? নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা। সামনে আর কোনও সূত্র নেই যে এগোনো যাবে।

লন্ডনে পৌঁছে সোজা রানা এজেন্সিতে গেল ও, হাতের জরুরী কাজগুলো শেষ করবে। ভাবতেও পারেনি ও অফিসে পৌঁছুনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে লাল ফোনটা।

ছয়

'রানা বলছি, স্যার।' বৃদ্ধের কঠোর চেহারাটা চোখের সামনে ভাসছে ওর। 'জ্বী?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

'ঠিকই শুনেছ, রানা,' জলদগম্ভীর স্বর ভেসে এল ও প্রান্ত থেকে, 'প্রফেসর ইব্রাহিমের অবস্থাও আর সব অপ্রকৃতিস্থ বিজ্ঞানীদের মত। একটু আগে তাঁর ওয়াইফ ফোন করেছিলেন।'

'কিভাবে, স্যার...'

'সেটা তোমাকেই জানতে হবে,' ওকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান।

দ্রুত চিন্তা করে চলেছে রানা। যা কিছুই ঘটে থাকুক, ও প্রফেসরকে ছেড়ে আসার পর ঘটেছে। তার মানে গত কয়েক ঘণ্টায়।

'আমি তাঁকে দেখতে চাই,' প্রচণ্ড রাগ চেপে অনুমতি চাইল রানা।

'সন্ধে সাতটার রোম ফ্লাইটে তোমার জন্যে টিকেট বুক করা আছে। ওখানে কয়েকজন ডাক্তার তোমাকে ব্রিফ করবেন।' ফোন রেখে দিলেন রাহাত খান।

রানা টের পেল, ওর ব্যর্থতায় হতাশ হয়েছেন মেজর জেনারেল। নিজের ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ অনুভব করল ও। ওর নাকের ডগায় বসে কলকাঠি নেড়েছে কেউ, যেন নীরবে ওকে বলছে, পেলে কিছু টের? তুমি আমাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নও, রানা।

রোমে প্রফেসরকে যে হাসপাতালে রাখা হয়েছে সেখানে এয়ারপোর্ট থেকে

সরাসরি পৌঁছে গেল রানা, একজন নার্স ওকে পথ দেখিয়ে প্রফেসরের কেবিনে নিয়ে গেল। রানা ভেতরে ঢুকতেই চলে গেল সে বিদায় নিয়ে।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রানাকে দেখলেন মিসেস ইব্রাহিম, মনে হলো হঠাৎ এই বিপদে একেবারে ভেঙে পড়েছেন তিনি।

মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন প্রফেসর ইব্রাহিম, নিস্পৃহ চেহারা, দু'কষা বেয়ে অনবরত লালা ঝরছে, বিড়বিড় করে আধো আধো উচ্চারণে বাংলায় বলছেন, 'আম্মু...আম্মু...দুদু খাব।'

নাম ধরে ডাকল রানা, কোনও জবাব পেল না। হামা দিয়ে খাটের তলায় ঢুকলেন ডক্টর ইব্রাহিম।

'ডাক্তাররা আপনার জন্যে হলরুমে অপেক্ষা করছেন, মিস্টার রানা,' কাঁপা গলায় জানালেন মিসেস ইব্রাহিম।

আরেক নার্সের পেছন-পেছন একটা ফয়া পার হয়ে হলরুমে ঢুকল রানা। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের যে ডাক্তাররা পরীক্ষা করেছেন তাঁদের কয়েকজন উপস্থিত আছেন ঘরে। প্রত্যেকের চেহারা গম্ভীর, থমথমে। একজন হাত নেড়ে রানাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

বসল রানা, সরাসরি কাজের কথায় এল। 'আরোগ্য লাভের কোনও সম্ভাবনা আছে?' কাউকে নয়, সবাইকে প্রশ্ন করল রানা।

জবাব দিলেন ডাক্তার রশিদ হায়দার। বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট তিনি। আগেও রানা তাঁর নাম শুনেছে। দীর্ঘকায় প্রৌঢ় মানুষ, চুলগুলো ধূসর, কপালে অসংখ্য ভাঁজ। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'না, মিস্টার রানা, প্রফেসর ইব্রাহিম আর কোনও দিনই মনে হয় না সেরে উঠবেন। তাঁর মাইন্ড পুরোপুরি গন। নিউরোলজিক্যাল টেস্ট করে দেখা গেছে তাঁর ব্রেইনের অর্গানিক ফাঙ্কশনিং প্রায় বন্ধ। অবস্থাটা ইররিপেয়ারেবল। আসলে তাঁকে পরীক্ষা করাটা স্রেফ কর্তব্য বলেই পরীক্ষা করা হয়েছে। আগের মানুষগুলোর ওপর করা পরীক্ষাই তাঁর অবস্থা বোঝার জন্যে যথেষ্ট ছিল। আমাদের প্রেজেন্ট মেডিক্যাল এবিলিটি যা, তাতে এ-ধরনের অর্গানিক ডিসফাঙ্কশনিং সারানোর কোনও উপায় নেই। টোটাল ব্রেইন ড্যামেজ, মিস্টার রানা। আমাদের কারও কিছু করার নেই।'

আরেকজন ফিজিশিয়ান মুখ খুললেন, 'শুনলাম আপনারা তদন্ত করছেন। ধারণা করছেন, এসবের পেছনে নির্দিষ্ট কোনও মানুষের হাত আছে।'

'তা-ই তো ভাবছি আমরা,' অস্বীকার করল না রানা। 'আপনারা বলেছেন ভাইরাস অথবা কোনও ধরনের রে এর জন্যে দায়ী হতে পারে। এদুটো সম্ভাবনা নিয়েই তদন্ত করব আমি।'

আবার মুখ খুললেন ডাক্তার রশিদ হায়দার, 'আমরা এখন ধারণা করছি

আইএসএস মীটিঙে সত্যিই এমন কেউ আছে যে রোগটা ছড়াচ্ছে। সম্ভবত নিজে সে এ ভাইরাসে ইমিউন।...কোনও রকম রে যদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে মীটিঙেই কাজটা করা হয়েছে। আইএসএস মীটিঙের সঙ্গে ব্রেইন ড্যামেজের একটা সম্পর্ক আছে বলে ধারণা করছি আমরা।'

চুপ করে থাকল রানা; ভাবছে। আইএসএস মীটিঙের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, ঠিকই ধারণা করছেন ডাক্তাররা। কিন্তু কে করছে কাজটা, কিভাবে করছে সেটা ওকেই বের করতে হবে। ও যা জানে তা ডাক্তাররা জানেন না। সেই ইহুদি মহিলা, টড রলিন্স, তার মুখে ডক্টর ইব্রাহিমের নাম, তার আগে ডকে খুনোখুনি, পরে ব্রিজের কাছে মহিলাকে শেষ করে দেয়া– প্রফেশনালদের কাজ। মোসাদ। কিন্তু ধরা যাচ্ছে না কাউকে।

বিদায় নিয়ে আবার প্রফেসরের ঘরে ফিরে এল রানা। ঢুকতেই শুনতে পেল ফোঁপানির আওয়াজ। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে অ্যাঞ্জেলিয়া কাঁদতে কাঁদতে। রানাকে দেখেই দ্রুত চোখ মুছল। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সেনিয়রা ইব্রাহিম, চোখ স্বামীর ওপর, মেঝেতে। রানাকে এগোতে দেখে অ্যাঞ্জেলিয়ার কালো চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল।

'নিজের চোখে দেখার জন্যে ফিরে এসেছ, না?' ফুঁসে উঠল উত্তেজিত অ্যাঞ্জেলিয়া, নীল ব্লাউজের তলায় ঘনঘন ওঠানামা করছে ভরাট স্তন, অভিযোগের সুরে বলল, '...আর তোমারই ওপর দায়িত্ব ছিল খালুকে দেখে রাখার! তুমি আসার আগে পর্যন্ত খালু ঠিকই ছিল। তুমিই কিছু একটা করেছ!'

শুধু রাগ নেই মেয়েটার জ্বলজ্বলে চোখে, তীব্র ঘৃণা আর প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলছে দু'চোখ। রানাকে দেখে যে তার আক্রোশ বেড়েছে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন মিসেস ইব্রাহিম, অ্যাঞ্জেলিয়ার কনুই ধরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলেন, ফিরে এলেন একটু পর। বললেন, 'অ্যাঞ্জেলিয়ার আচরণের জন্য আমি সত্যি ক্ষমাপ্রার্থী, মিস্টার রানা। ছোটবেলা থেকেই খালুকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে ও। পোর্টোফাইনোতে যাওয়ার পথে ওকে আমরা জানিয়েছিলাম ওর খালুর বিপদ হতে পারে, আপনি আসছেন তাঁকে রক্ষা করতে।'

মিসেস ইব্রাহিমকে রানা জানাল অ্যাঞ্জেলিয়ার অনুভূতির কারণ বুঝতে পেরেছে ও, কিছু মনে করেনি। ও নিজেও মাত্র এ কয়দিনেই হাসিখুশি সরলসোজা ডক্টর ইব্রাহিমকে পছন্দ করে ফেলেছিল। অ্যাঞ্জেলিয়ার চোখে ঘৃণা দেখেছে ও। ও নিজেও অন্তরে শীতল ঘৃণা অনুভব করছে। মনে মনে শপথ করল, যারা একের পর এক গুণী মানুষগুলোর সর্বনাশ করছে, তাদের পরিবারকে বিপর্যয়ের মুখে

ঠেলে দিচ্ছে, নির্দ্বিধায় তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেবে ও সুযোগ পেলে।

এখনও রানার স্থির বিশ্বাস, ও রোমে বিজ্ঞানীকে ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্ত সবকিছুই ঠিক ছিল।

'আমি চলে যাবার পর আপনাদের সঙ্গে কেউ দেখা করেছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'রাতে, অথবা পরেরদিন?'

'না,' ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন তেরেসা, 'কেউ আসেনি। অ্যাঞ্জেলিয়া সকাল পর্যন্ত ছিল, তারপর বাড়ির পথে রওনা হয়ে যায়।'

শুধু অ্যাঞ্জেলিয়া ছিল। ভাবনাটা রানার পছন্দ হলো না, কিন্তু চিন্তাটা মাথা থেকে দূরও করতে পারল না। এমন কি হতে পারে যে অ্যাঞ্জেলিয়া দায়ী? নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, কতটুকু চেনে ও অ্যাঞ্জেলিয়াকে? বিশ্বাস করতে পারল না মেয়েটা দায়ী। তাই যদি হতো তাহ'লে আগের বিজ্ঞানীদের ক্ষতি করেছে কে?

বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে এসেছেন ডক্টর ইব্রাহিম, হামাগুড়ি দিয়ে স্ত্রীর পায়ের কাছে চলে এলেন, খপ করে মহিলার বুড়ো আঙুলটা ধরে মুখে পুরলেন। পা সরিয়ে নিলেন মিসেস ইব্রাহিম, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে, চোখে টলটল করছে অশ্রু। চোখ সরিয়ে নিল রানা, কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি খালুর অবস্থা অ্যাঞ্জেলিয়াকে জানিয়েছিলেন বলে এসেছে ও? জানত যে আমি দেখতে আসছি?'

আস্তে করে মাথা দোলালেন মহিলা। 'আপনার বসের কাছ থেকে ফোন পাই আমি।'

'অ্যাঞ্জেলিয়াকে আমি আসছি জানানোর পর সে কি বলল?'

'বলল এক্ষুণি রওনা দিচ্ছে। ওর ধারণা হয়েছিল আপনি ওর খালুকে অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবেন। সেজন্যে খালুকে দেখতে এসেছে।'

অ্যাঞ্জেলিয়া এমন কিছু দেখেছে যা ওর চোখ এড়িয়ে গেছে? দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। প্রতিটা সম্ভাবনা যাচাই করে দেখতে হবে ওকে। হাতে কোনও সূত্র নেই।

রানার স্থির বিশ্বাস, ও রোম ছাড়ার পর কেউ একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করেছে। কে? কিভাবে? খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো প্রশ্ন, কিন্তু একটারও জবাব জানা নেই রানার।

বুঝতে পারছে যেকোনও একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে পারলেই অন্য প্রশ্নটার জবাব পেয়ে যাবে ও। আগে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে অ্যাঞ্জেলিয়াকে। হল রুমে চলে এল রানা। অ্যাঞ্জেলিয়া নেই। সিঁড়ির কাছে এসে একবার বাইরে উঁকি দিল। রোমের অন্ধকার রাস্তা ফাঁকা। মেয়েটা কোথাও নেই। মিসেস ইব্রাহিমের কাছে ফিরে এল রানা, বলল, 'অ্যাঞ্জেলিয়া চলে গেছে। রোমে ওর পরিচিত কোনও

জায়গা আছে যেখানে ও উঠতে পারে? কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের বাসায়?'

মাথা নাড়লেন তেরেসা। 'না, আমরা ছাড়া রোমে ওর আর কোনও আত্মীয় নেই। ও বোধহয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, মন খুব খারাপ তো।'

মেয়েটাকে জেরা করার জন্যে খুঁজে বের করতে হবে, মিসেস ইব্রাহিমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, সিঁড়িতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল রানা। সামনেই ছোট একটা প্লাজা। রোড ল্যাম্পের মৃদু আলোয় স্কয়ারের কোনাগুলোয় চোখ বুলাল ও। দূরের কোনায় ল্যাম্পের হলদে আলোয় অ্যাঞ্জেলিয়াকে দেখতে পেল। ওখানে ও পৌঁছনোর আগেই একটা আঁধার গলিতে ঢুকে গেল মেয়েটা। রানাও দ্রুত পায়ে পিছু নিল। কোব্‌ল্ পাথরের তৈরি সরু রাস্তা, দু'ধারে ছোট-ছোট দোকান, বেকারি আর গ্রোসারির। মাঝে মাঝে ফল বিক্রির বন্ধ দোকানও আছে কয়েকটা। একটু পরপরই বন্ধ দরজা। কান পাতল রানা, হাইহিলের খটখট আওয়াজ শুনতে পেল না। বন্ধ একটা দরজার কাছে লুকিয়ে আছে মেয়েটা, রানাকে দেখে বেরিয়ে এল, অপেক্ষা করছে। পা বাড়াল রানা, অন্ধকারেও টের পেল, চোখে ঘৃণা নিয়ে ওকে দেখছে অ্যাঞ্জেলিয়া।

'আমার পিছু নিয়েছ কেন?' জিজ্ঞেস করল।

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে,' বলল রানা, হাঁটা থামায়নি।

এক পা পিছিয়ে অর্ধেক ঘুরে গেল অ্যাঞ্জেলিয়া, দৌড় দেবার জন্যে প্রস্তুত। হাত বাড়াল রানা মেয়েটার কনুই ধরার জন্যে, ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনে শুনতে পেল জুতোর হালকা খসখস আওয়াজ।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল ও, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মাথার পাশে লাগল প্রচণ্ড ঘুসিটা। তীক্ষ্ণ ব্যথা, চোখের সামনে অজস্র নক্ষত্র জ্বলতে নিভতে দেখল রানা। হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে, বুঝতে পারছে কিছুতেই জ্ঞান হারানো চলবে না।

পায়ের শব্দ পেল। অনেকগুলো। বসে পড়ল রানা, সামনে একজোড়া পা দেখতে পেয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গায়ের জোরে টান দিল। ইটালিয়ান ভাষায় গালি দিল লোকটা, তারপর দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল রাস্তায়। লোকটার ওপর চড়ে বসল রানা, মাথার যন্ত্রণায় এখনও চোখে ঝাপসা দেখছে। লোকটার পরনে একটা খাটো সোয়েটার, গলার কাছে খামচে ধরল রানা। কে যেন ওর পাঁজরে ধাঁই করে লাথি মারল। বেঁটে মোটার বুকের ওপর থেকে ছিটকে পড়ে গেল রানা, পড়েই গড়াতে শুরু করল। একের পর এক পা ওর হাতের নাগালে আসছে, অন্ধের মত হ্যাঁচকা টান দিয়ে চলেছে রানা। এক লোক ধড়াস করে পড়ল ওর গায়ের ওপর। বাম হাতে তার পাঁজরে ঘুসি মারল রানা, শুনতে পেল ব্যথা

পেয়ে অসন্তুষ্ট গর্জন ছাড়ল লোকটা। মাথা একটু পরিষ্কার হয়েছে রানার, বুঝতে পারছে অন্তত চার-পাঁচজন মিলে আক্রমণ করেছে ওকে। রাস্তায় দু'পায়ে লাথি মেরে ছিটকে সোজা হলো ও, মাথা দিয়ে ঢুঁ মারল সামনের লোকটার পেটে, তারপর লোকটাকে সহ পড়ে গেল রাস্তায় হুড়মুড় করে। পড়েই লাফ দিয়ে উঠল, হাত ধরে টেনে তুলল লোকটাকে, এলোপাতাড়ি ঘুসির তোয়াক্কা না করে জুডোর কৌশলে কাঁধের ওপর দিয়ে থ্রো করল। ঝনঝন করে ভেঙে গেল একটা বেকারির কাঁচ। গ্লাস ভাঙার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল লোকটার আর্তনাদ। একেবারে দোকানের ভেতরে ছিটকে গিয়ে পড়েছে।

মাথার ঠিক নেই, স্রেফ ট্রেইনিঙের কারণে এখনও লড়ছে রানা। চোখের সামনে এক লোকের মুখ দেখতে পেয়ে ঘুসি মারল, ক্ষণিকের জন্যে সন্তুষ্টি বোধ করল চোয়ালে ওর মুঠো লাগার থ্যাচ শব্দে। সামনে থেকে মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই পেছন থেকে রানার মাথায় লাঠি দিয়ে বাড়ি মারল কেউ। পড়ে গেল রানা। ওর মাথায় শক্ত সোলের জুতো দিয়ে লাথি মারল আরেকজন। জ্ঞান হারানোর আগে অ্যাঞ্জেলিয়ার কণ্ঠ শুনতে পেল ও। চালাকি করে ওকে ফাঁদে ফেলেছে মেয়েটা। মাথা তোলার চেষ্টা করল রানা, পারল না। মাথায় আরেকটা লাথি লাগতেই অন্ধকার হয়ে গেল দুনিয়া, যেন চোখের সামনে কালো একটা পর্দা নেমেছে।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরেছে বলতে পারবে না রানা, তবে মাথা-ব্যথার পরিমাণ অনুভব করে আন্দাজ করল, মাঝখানে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। আস্তে করে ঘাড় নাড়াল ও, চোখের সামনে থেকে ঝাপসা ভাবটা কেটে যাচ্ছে দ্রুত। কব্জিতে চেপে বসা দড়ির কামড়ে বুঝতে পারল পিঠের কাছে হাত দুটো বেঁধে রাখা হয়েছে। চারপাশে তাকাল ও। একা নেই ও, আরও চারজন মুশকো লোক আছে ভ্যানে। ড্রাইভারের পার্টিশনের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওকে। দু'পাশে বসেছে দু'জন দু'জন করে। চেহারা আর আকৃতি দেখে বোঝা যায় কঠোর পরিশ্রমী লোক তারা, পরনে চাষীদের পোশাক, পায়ে গ্রাম্য বুট জুতো। হাতগুলো দেখার মত। শিরা ওঠা, মোটা-মোটা আঙুল। রানা দেখল তিনজনের চেহারায় মার খাওয়ার চিহ্ন, গাল আর ঠোঁট ফেটে গেছে তাদের।

ওদের একজন ড্রাইভারকে ইটালিয়ানে বলল, 'ঘুম ভেঙেছে শালার।'

'সাবধান!' জবাব এল। 'ত্যাঁদোড় লোক।'

এবার অ্যাঞ্জেলিয়ার গলা শুনতে পেল রানা। 'বদমায়েশী করার কোনও সুযোগ যাতে না পায় ও।'

সতর্ক করার কোনও দরকার ছিল না, আপাতত কিছু করার ইচ্ছে নেই রানার, ও জানতে চায় কোথায় ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ট্রাকটা ঢাল বেয়ে

উঠছে, সম্ভবত ক্যালাব্রিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে সংক্ষেপে কথা সারছে লোকগুলো, বলছে আঞ্চলিক ক্যালাব্রিয়ান ভাষায়। এদের সঙ্গে ওর অ্যাসাইনমেন্টের কি সম্পর্ক তা বুঝতে পারল না রানা।

রাস্তা ক্রমেই খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে, লাফাতে শুরু করেছে ট্রাকটা, ঘন-ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে। হাতের বাঁধন নেড়েচেড়ে দেখল রানা। অভিজ্ঞ হাতে বেঁধেছে, এমন গরু-বাঁধা গিঁঠ যে নিজে থেকে খোলা যাবে না। ওয়ালথারটা নিয়ে নিয়েছে, কিন্তু কনুইয়ের ভেতর দিকে চামড়ার খাপে রাখা ছোরাটা খুঁজে পায়নি। তাড়াহুড়ো করে ওকে গাড়িতে তোলা হয়েছে, তাছাড়া, রানা বুঝতে পারছে, পেশাদার লোক নয় এরা। হলে সরু ওই গলিতে সবাই মিলে হুড়োহুড়ি করে ওকে ধরার চেষ্টা করে বেকায়দা মার খেত না। প্রথম আঘাতটা অত প্রচণ্ড না হলে রিফ্লেক্স নষ্ট হত না ওর, এখনও গলিতে শুয়ে কোকাতে হত লোকগুলোর।

ট্রাকের গতি কমে এল, বাঁক ঘুরল আরও দুটো, তারপর থেমে গেল, খুলে গেল ভ্যানের পেছনের দরজা। রানাকে পাঁজাকোলা করে বের করা হলো। অ্যাঞ্জেলিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। আঁটো পোশাকে দারুণ লাগছে মেয়েটাকে দেখতে। অবশ্য মাথার ব্যথায় ভাল করে তাকাতে পারল না রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'ভাল বন্ধু জুটিয়েছ তুমি।'

'ওরা আমার ভাই,' তিন ষাঁড়কে দেখিয়ে বলল অ্যাঞ্জেলিয়া। 'ছোট ভাই। অন্য দু'জন আমার কাযিন। ওরাও ছোট।'

'কিসের ছোট,' মনে মনে বলল রানা, 'আমি তো দেখছি একেকটা বিকট ধেড়ে বদমাশ।' মুখে বলল, 'পারিবারিক মহামিলন।' ভাবছে না মস্ত কোনও বিপদে পড়েছে।

'যখন শুনলাম খালুকে পঙ্গু করতে পেরেছ কিনা নিশ্চিত হতে আবার আসছ, ভাইদের সঙ্গে নিয়ে রোমে গেলাম আমি।' কড়া শোনাল অ্যাঞ্জেলিয়ার কণ্ঠ। 'এবার আমরা তোমার পেট থেকে বের করব কি করেছ তুমি খালুর। কেন করেছ।'

'আমি কিছুই করিনি,' বলল রানা। চোখ কুঁচকে ফেলল। চড়াৎ করে ওর গালে চড় বসিয়েছে মেয়েটা।

'ওকে ভেতরে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল অ্যাঞ্জেলিয়া, 'যথেষ্ট শুনেছি ওর মিথ্যে কথা।'

পাথুরে চত্বর পার করে একটা কিচেনে ঢোকানো হলো রানাকে। বিরাট একটা ঘর, রান্নার বিভিন্ন সরঞ্জাম ঝুলছে দেয়াল থেকে। রানাকে একটা খটখটে চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো, হাত দুটো এখনও পিছমোড়া করে বাঁধা। আরও নিরাপত্তার জন্যে চেয়ারের পিঠের সঙ্গে আরেকবার বাঁধা হলো ওর হাত। সামনে

দাঁড়িয়ে তদারক করছে অ্যাঞ্জেলিয়া। কাজ শেষ করে তার পেছনে দাঁড়াল বাধ্য ষাঁড়গুলো।

রাগে জ্বলছে অ্যাঞ্জেলিয়ার চোখ, রানার ভেতরটা দেখে নেবার ইচ্ছেয় একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'যখন আমার মনে পড়ে তোমার সঙ্গে...' কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল অ্যাঞ্জেলিয়া, চেহারায় ফুটে উঠল নিখাদ অস্বস্তি, চট করে ভাইদের দিকে তাকাল। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে তারা।

'হ্যাঁ, বাকিটাও বলো,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

গায়ের জোরে ওর গালে চড় কষাল অ্যাঞ্জেলিয়া। হিসহিস করে বলল, 'খুন করে ফেলব তোমাকে আমি, নরকের কীট! বলো কি করেছ খালুর।'

'আমি কিছুই করিনি,' চোখে চোখ রেখে বলল রানা।

আবার চড় মারল অ্যাঞ্জেলিয়া।

গলা চড়ে গেছে। 'আর একটা মিথ্যেও নয়!' রাগ আর বিদ্বেষ ঝরে পড়ছে মেয়েটার দু'চোখ থেকে। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। এ মেয়ে সত্যিই ওকে দায়ী ভাবছে।

'সত্যি তুমি মনে করো আমি করেছি কাজটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'অবশ্যই। আর সেজন্যে তোমাকে মরতে হবে।'

'এখনই শেষ করে দিলে হয় না?' ভোঁতা চেহারার একজন মাঝখান থেকে জানতে চাইল, চেহারা গম্ভীর।

'না,' প্রায় ধমকে উঠল অ্যাঞ্জেলিয়া, 'আগে জানতে হবে কি করেছে ও, কেন করেছে।'

'যা হবার তা তো হয়েই গেছে,' বোকা-বোকা চেহারার আরেকজন প্রতিবাদের সুরে বলল, কান দুটো হাতির কানের মত বড় তার, 'এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি। সময় নষ্ট না করে ওকে খতম করে দিলেই কাজ শেষ হয়ে যায়।'

'সাইলেন্সিয়ো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমক দিল অ্যাঞ্জেলিয়া। 'ওসব আমি বুঝব।'

অবাক বিস্ময়ে লোকগুলোর কথা শুনছে রানা, বুঝতে পারছে ঠাট্টা হচ্ছে না এখানে, ঠাণ্ডা মাথায় ওকে মেরে ফেলার ব্যাপারে নির্বিকার ভাবে আলাপ চলছে। তিক্ত একটা অনুভূতি হলো ওর। অ্যাঞ্জেলিয়া নিশ্চিত যে কুকর্মটা ওর। অন্য সময় হলে হাসতে পারত ও, কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে গলার ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখে বুনো দৃষ্টি নিয়ে ওকে দেখছে যুবকরা।

'সত্যি বলছি, অ্যাঞ্জেলিয়া, আমি কিছুই করিনি। আমি দায়ী না।' যতটা সম্ভব সততা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা গলায়।

লাভ হলো না।

'মিথ্যের বেসাতি বন্ধ করো, মাসুদ রানা!' চড়া গলায় ধমকে উঠল অ্যাঞ্জেলিয়া। 'তুমি ছাড়া আর কেউ দায়ী হতে পারে না। তুমি এমন ব্যবস্থা করেছিলে যে তুমি ছাড়া আর কেউ খালুর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেনি। হয়তো মিনারাল ওয়াটারের বোতলে করে কিছু একটা নিয়ে এসেছিলে, খালুকে খাইয়েছ।'

'না, অ্যাঞ্জেলিয়া,' শান্ত স্বরে বলল রানা, 'আমাকে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে।' পিঠ বেয়ে কুলকুল করে ঘাম নামছে ওর, গলা শুকিয়ে কাঠ।

'আর তুমি কি করলে? ঠিক বিপরীত কাজটাই, তাই না? হয়তো আসল লোকই নও তুমি। হয়তো তুমি মাসুদ রানাই নও। হয়তো তাকে মেরে রেখে এসে তার স্থান নিয়েছ। যা-ই করে থাকো, আমরা তোমার পেট থেকে সত্যি কথাটা বের করে ছাড়ব।'

'সত্যিই বলছি আমি।'

'ওর মুখ খোলাতে অনেক সময় লাগবে,' বলল অ্যাঞ্জেলিয়ার এক ভাই। 'পরে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় না? শুয়োরগুলোকে এখনও খাবার দেয়া হয়নি। গরুর দুধ দোয়ানোও বাকি।'

'ঠিকই বলেছে পুচ্চিও,' আরেকজন সায় দিল। 'তুই আমাদের এত তাড়াহুড়ো করে ডেকে নিয়ে গেলি যে কোনও কাজই সেরে যেতে পারিনি। তাছাড়া আমার খিদে লেগেছে। প্রশ্ন-ট্রশ্ন পরে হবে, আগে খাবার ব্যবস্থা কর্।'

'আমি বলি কি ওকে শেষ করে ঝামেলার ইতি টানো,' প্রস্তাব করল বড় কানওয়ালা।

'না, আগে ওকে দিয়ে কথা বলাতে হবে,' জোর দিয়ে বলল অ্যাঞ্জেলিয়া। 'যার-যার কাজ সেরে এসো, তারপর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করব আমরা।' বড় কানওয়ালার দিকে তাকাল। 'গিটানো,' নির্দেশ দিল, 'তুমি এখানেই থাকবে, ওকে পাহারা দেবে। ও যদি পালানোর চেষ্টা করে তো আমাদের ডাক দেবে। কি বলেছি, বুঝেছ? একটু পরে খাবারের ব্যবস্থা করব আমি, আগে হাতের কাজ শেষ করে নিই।'

কুলোর মত কানওয়ালা গিটানো আস্তে করে মাথা দোলাল, চেহারা দেখে মনে হলো এত জটিল একটা নির্দেশ পুরোপুরি এখনও সে বুঝে উঠতে পারেনি।

শেষবারের মত রানাকে কড়া চোখে একবার দেখল অ্যাঞ্জেলিয়া, তারপর অন্যান্যদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল কিচেন ছেড়ে। ওদের কথা শুনে একটা ব্যাপারে রানা এখন নিশ্চিত, প্রফেসরের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় এরা এতই আবেগপ্রবণ হয়ে

পড়েছে যে যুক্তি দিয়ে এদের বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। তাছাড়া অ্যাঞ্জেলিয়ার সন্দেহ করার কারণ আছে, ও-ই একমাত্র লোক যে নিরাপদে বৈজ্ঞানিকের সর্বনাশ করতে পারত। বুঝতে পারছে, যেভাবে হোক ছুটে বেরিয়ে যেতে হবে। মুক্ত অবস্থায় হয়তো এদের বোঝানো সম্ভব হতে পারে যে ও দায়ী নয়।

কিচেনে চোখ বোলাল রানা। পাথরের বিরাট আভন, দেয়ালে পেরেকে ঝুলছে লোহার বড় বড় পট, হাঁড়ি আর সস্-প্যান। পিঠসোজা একটা চেয়ারে বসেছে গিটানো, সামনের টেবিলে দু'পা তুলে দিয়েছে, পকেট থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বের করে কাঠের একটা টুকরো চাঁছছে। চেয়ার পিছিয়ে নিয়ে যদি আভনের পাশের পাথরের দেয়ালে দড়ি ঘষে তাহলে এক মুহূর্তে গিটানোর চোখে পড়ে যাবে ও। চেয়ারের সঙ্গে বাঁধার কারণে ওটা এখন শরীরেরই একটা অংশ। আবার গিটানোর দিকে তাকাল রানা, মাঝখানের দূরত্ব মাপল, ভাবছে চেয়ার সহ দৌড়ে দিয়ে লোকটার পেটে মাথার ঢুঁ দেয়ার কথা। পরক্ষণে মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল। কোনও লাভ হবে না। গিটানোর কাছে পৌঁছনোর আগেই উঠে দাঁড়াতে পারবে সে। এমন কিছু করতে হবে যাতে এক পলকে মুক্ত হওয়া যায়।

চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে একদৃষ্টে গিটানোর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। লোকটা কাঠের টুকরো চাঁছায় আরও মনোযোগী হয়েছে, তবে মাঝে মাঝেই চোখ তুলে দেখে নিচ্ছে ওকে। পা দুটো টেবিলের ওপরে, চেয়ারটা পেছনে হেলানো, আদর্শ একটা টার্গেট, তবে দূরত্ব অনেক কমিয়ে আনতে হবে। হঠাৎ করেই রানা বুঝতে পারল, যতটা ভাবছে ততটা কাছে না গেলেও চলে। মোটামুটি দূরত্বে পৌঁছলেই যথেষ্ট। চেয়ারের একটা পায়া সাবধানে, নিঃশব্দে এক ইঞ্চি সামনে বাড়াল ও, চুপচাপ অপেক্ষা করছে।

রানাকে একবার দেখে নিয়ে আবার কাঠের টুকরোয় মনোযোগ দিল গিটানো। অন্যপাশের পায়াটা এক ইঞ্চি সামনে বাড়িয়ে আবার অপেক্ষায় থাকল রানা। একটু পর পর রানাকে পলকের জন্যে দেখে নিচ্ছে গিটানো। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোচ্ছে রানা। একেকবারে একটা করে পায়া ইঞ্চিখানেক সামনে বাড়াচ্ছে। প্রতিবার এতই কম এগোচ্ছে যে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে না থাকলে চট করে ধরা যাবে না। গিটানো এতই বোকা এবং অসতর্ক যে মনে আশা জেগে উঠল রানার।

শেষ পর্যন্ত থামল ও, আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না। কান পাতল, পাশের ঘরে কোনও আওয়াজ নেই, এখনও বাইরের কাজ সেরে ফিরতে পারেনি কেউ।

ঝট করে সামনে বাড়ল রানা, গায়ের জোরে লাথি মেরে বসল গিটানোর চেয়ারে। চেয়ারটা পিছলে বেরিয়ে গেল লোকটার তলা থেকে। ধপাস করে মেঝেতে খসে পড়ল গিটানো, পরক্ষণে ব্যথায় কাতরে উঠে দু'হাতে পাছা খামচে ধরল। আরেক লাথিতে তাকে মেঝেতে শুইয়ে ফেলল রানা, এখনও ওর পিঠে

চেয়ার বাঁধা, একটা হাঁটু রাখল গিটানোর বুকে, দেহের ভর চাপাল গিটানোর বুকে রাখা হাঁটুর ওপর, আরেক হাঁটু রাখল গিটানোর গলার ওপর।

গলায় চাপ বাড়াতেই চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল গিটানোর, বড় বড় কানগুলো লাল হয়ে উঠেছে। গলার ওপর চাপ কমাল রানা, তবে সাবধান করল, 'একটু উল্টোপাল্টা করো, খতম হয়ে যাবে। গলায় চাপ বাড়ালে উইন্ডপাইপ ছিঁড়ে যাবে, মরতে আধ সেকেন্ডও সময় নেবে না তুমি!' কথা সত্যি সেটা বোঝাতে হাঁটুর চাপ বাড়াল রানা, জিভ বেরিয়ে গেল গিটানোর। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। চাপ কমাল রানা। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজাল গিটানো।

'এবার যা বলছি করবে,' নির্দেশ দিল রানা। 'শুয়ে আছ শুয়ে থাকো, কিন্তু আমার হাতের গিঁঠ দেয়া রশি খুলবে তুমি। ধীরে-ধীরে, সাবধান! একটু এদিক-ওদিক দেখলে খুন করে ফেলব।' হাঁটুর চাপ বাড়িয়ে কমিয়ে কথার সত্যতা বোঝাল ও। দেরি না করে রানার হাতের বাঁধন খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গিটানো, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে নিষ্পলক দেখছে রানাকে। দড়ির চাপ কমছে হাতের ওপর, রানা তাড়া দিল, 'কই, দেরি কিসের?'

গিটানোর আঙুলগুলো আরও দ্রুত কাজ করতে শুরু করল। আধ মিনিটেই দড়ির গিঁঠ খুলে গেল, হাত দুটো মুক্ত হয়ে গেল রানার। বাইরে শুনতে পাচ্ছে গলার আওয়াজ, এদিকেই আসছে, কাজ সেরে ফিরছে অ্যাঞ্জেলিয়া আর তার ভাইরা। প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল রানা গিটানোর চোয়ালে। মাথাটা কাত হয়ে গেল বড় কানের, জ্ঞান হারিয়েছে।

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল রানা, হাতে বেরিয়ে এসেছে ছোরাটা। ওটা ব্যবহার করার ইচ্ছে নেই ওর, আবার ঢুকিয়ে রাখল চামড়ার খাপে। এরা যতই গোঁয়ার হোক, ভাল মানুষ, যেটা ভাল মনে করছে সেটাই করেছে। দেয়ালের পেরেক থেকে লোহার একটা প্যান হাতে নিল রানা। যা ওজন তাতে বুঝল কেন ইটালিয়ান গৃহবধূরা এত প্যাস্তা খায়। শরীরে জোর না থাকলে এই জিনিস কেউ তুলতে পারে না। সস্-প্যানটা দিয়ে ওয়েইট লিফটিঙ প্র্যাকটিস করা যাবে।

দরজার পাশে দাঁড়াল রানা ওটা হাতে নিয়ে। পরক্ষণে দরজা খুলে গেল, অ্যাঞ্জেলিয়া ভেতরে ঢুকল আগে, তার পেছনে চার ভাই।

ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলিয়া। 'মিয়ো ডিয়ো! (হায় ঈশ্বর!) মাসুদ রানা পালিয়েছে!'

অ্যাঞ্জেলিয়ার পেছনে থমকে দাঁড়িয়েছে ওর ভাইয়েরা। সস্-প্যান ঘুরিয়ে গায়ের জোরে আঘাত হানল রানা, পরক্ষণেই প্যান ছেড়ে অ্যাঞ্জেলিয়াকে হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল গায়ের কাছে। এক সঙ্গে দু'জনের মুখে বাড়ি খেয়েছে ভারী সস্-প্যান, জ্ঞান হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ল তারা, নাক ফেটে রক্ত ঝরছে।

ছোরাটা বের করে অ্যাঞ্জেলিয়ার গলায় ধরল রানা, শুনতে পেল আঁৎকে উঠে শ্বাস নেয়া বন্ধ করল মেয়েটা। তার দুই ভাই বোনের বিপদ বুঝতে পেরে বরফের মত জমে গেছে জায়গায়।

'আগে জাগাও ওদের,' অচেতন তিনজনকে দেখিয়ে দুই যুবককে নির্দেশ দিল রানা।

কেতলিতে পানি ভরে অজ্ঞান লোকগুলোর মুখে ঢালল একজন, জ্ঞান ফিরে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল গিটানো, অন্যরা শুয়ে থেকেই চোখ মেলে চাইল, চেহারা দেখে মনে হলো ভিনগ্রহের বাসিন্দা, এই মাত্র আকাশ থেকে পড়েছে।

'এবার আমার কথা মন দিয়ে শোনো,' বলল রানা গম্ভীর স্বরে। 'তোমাদের খালুর কোনও ক্ষতি আমি করিনি। মোটা মাথায় কথাগুলো গেঁথে নাও। এর আগে আরও সাতজন মুসলিম বিজ্ঞানীর ব্রেইন নষ্ট করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকারের আদেশে আমি তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। আমার কথার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব দাও, আগের সাতজনের জন্যেও কি আমিই দায়ী?

'আমাকে পাঠানো হয়েছিল আমি তাঁর স্বদেশী বলে। কিন্তু তাঁকে রক্ষা করতে পারিনি আমি।'

অ্যাঞ্জেলিয়ার নরম বুকে ঠেকে আছে ছোরার ফলা। একটা চিন্তা মাথায় খেলল রানার। ও যদি লোকগুলোকে বোঝাতে পারে যে ও নির্দোষ, তাহলে এই জটিল পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বেরোতে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করতে হবে না। তাছাড়া সেক্ষেত্রে এরা ওকে ফলোও করবে না। আল্লাহ জানেন আরও কত আত্মীয় কোথায় কোথায় ছড়িয়ে আছে অ্যাঞ্জেলিয়ার! ঝুঁকিটা নেবে, ঠিক করে ফেলল রানা। যদি ওর মনমত ফলাফল না হয় তাহলে সব কয়জনের সঙ্গে লড়তে হবে ওকে। তাতে ওর কোনও আপত্তি নেই। আস্তে করে অ্যাঞ্জেলিয়াকে ছেড়ে পিছিয়ে গেল রানা, মেয়েটার হাতে ধরিয়ে দিল ছোরাটা। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলিয়ার চোখ। ওর ভাইরাও বিশ্বাস করতে পারছে না কি ঘটছে।

'অ্যাঞ্জেলিয়া, তোমাকে বুঝতে হবে, তুমি যেমন নও, তেমনি আমিও দায়ী নই। সামান্য যা কিছু সূত্র আছে আমার হাতে, তার ওপর ভিত্তি করে তদন্ত করতে হবে। এখন ইচ্ছে করলে তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারো। তবে তাতে কোনও লাভ হবে না। কোনও দিনই তোমাদের খালুকে আর সুস্থ করে তোলা যাবে না। আমি শিওর নই, তবে আমার ধারণা এই অসুখের চিকিৎসা আছে। যে অসুখটা সৃষ্টি করেছে সে কি অ্যান্টিডোট তৈরি করেনি? নিজে সে এফেক্টেড হয়ে গেলে? আমি চেষ্টা করব অ্যান্টিডোট থাকলে সেটা যাতে উদ্ধার করা যায়। তাহলে কেবল ডক্টর ইব্রাহীমই নয়, আরও সাতজন বিজ্ঞানী হয়তো সুস্থ হয়ে উঠতে

পারেন। আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই। আমি নির্দোষ সেটা প্রমাণ করতে এর বেশি আর কিছু বলার নেই আমার।'

অ্যাঞ্জেলিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই, অপেক্ষা করছে, সে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে। হঠাৎ করেই ফুঁপিয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলিয়া, পরক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে, কাঁদছে, দরদর করে জল গড়াচ্ছে দু'চোখ বেয়ে। ভেজা স্বরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করে দাও, রানা। তোমাকে সন্দেহ করা আমার উচিত হয়নি।'

এগিয়ে এল অ্যাঞ্জেলিয়ার ভাইগুলো, বিড়বিড় করে ক্যালাব্রিয়ানে ক্ষমা চাইছে আর রানার পিঠে আন্তরিক চাপড় মারছে। রানার মনে হলো পিঠ ফাটিয়ে ফেলার মতলব করেছে ওরা।

'ভাগ্য ভাল যে কারও কোনও ক্ষতি হয়নি,' বলল ও। 'এবার আমাকে রোমে ফিরতে হবে। ওখান থেকেই তদন্ত শুরু করব। তাড়াতাড়ি যাওয়ার কোনও উপায় জানা আছে তোমাদের কারও?'

লক্ষ্মী মেয়ের মত আস্তে করে মাথা দোলাল অ্যাঞ্জেলিয়া। 'গিটানো, ট্রাকটা বের করো। আমরা এখনই রোমে যাব।'

বাঁট সামনে বাড়িয়ে রানার হাতে ওয়ালথারটা ধরিয়ে দিল গিটানো, তার আগে চোখে লোভ নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল ওটার দিকে। চেহারা দেখে মনে হলো না কানে কোনও কথা ঢুকেছে। কিন্তু ঢুকেছে আসলে, বেরিয়ে গেল সে ট্রাক বের করতে।

অ্যাঞ্জেলিয়ার কথার মানে পরিষ্কার হতেই জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি "আমরা" বলতে কাদের বোঝাচ্ছ?'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,' একগুঁয়ে স্বরে জানিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলিয়া।

'না, অ্যাঞ্জেলিয়া,' বোঝানোর চেষ্টা বৃথা জেনেও বলল রানা, 'এটা পুরুষমানুষের কাজ। যেকোনও সময় যেকোনও বিপদ ঘটতে পারে।'

'যা-ই ঘটুক আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি,' দৃঢ় কণ্ঠে জানাল অ্যাঞ্জেলিয়া, রানা দেখল তার ভাইদের ভ্রূগুলো একটু একটু করে কুঁচকে উঠছে। বাইরে ট্রাকের আওয়াজ হলো। দড়াম করে বন্ধ হলো ট্রাকের দরজা। গিটানো ভেতরে ঢুকল। 'খালুর যারা সর্বনাশ করেছে তাদের শেষ না দেখে ছাড়ব না আমি।'

'এটা পারিবারিক সম্মানের ব্যাপার,' বোনকে সমর্থন জানাল গিটানো। ওরা অজান্তেই এগিয়ে আসছে। আবেগপ্রবণ ইটালিয়ান যুবকদের ভাল করেই চেনা আছে রানার। এখন তর্কাতর্কি চলতে থাকলে ব্যাপারটা যেকোনও সময়ে আরেক দফা মারামারিতে গড়াবে।

'ভাবছ আমাদের বোন তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না, মিস্টার রানা?'

'বেশ,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, 'অ্যাঞ্জেলিয়া আমার সঙ্গে যাচ্ছে। ভেবে

দেখলাম ওর সাহায্য আমার দরকার হতেও পারে।'

'গিটানোও যাবে।'

আপত্তি করল না রানা। পাহাড়ী এই অঞ্চল থেকে দ্রুত বের হতে হলে অ্যাঞ্জেলিয়ার সাহায্য না নিয়ে কোনও উপায় নেই।

নাস্তা তৈরি করার সময় নেই, তাই পাউরুটি আর ঘরে বানানো পনির দিয়ে কাজ সারল সবাই, তারপর আন্তরিক বিদায় সম্ভাষণের মাঝ দিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। রানা লক্কড়ঝক্কর পুরানো ট্রাকটা চালাচ্ছে, তার পাশে অ্যাঞ্জেলিয়া আর গিটানো। রানা ভেবে দেখল, অ্যাঞ্জেলিয়ার সঙ্গে বিদায়টা আবেগঘন হবে না বটে, কিন্তু সামলে নিতে পারবে মেয়েটা।

পাহাড়শ্রেণী শেষ হতেই সামনে আলো দেখতে পেল রানা। মেইন রোড ক্রসিং।

'কখনও এখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরেছ?' যেন কথার কথা, সহজ গলায় জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল অ্যাঞ্জেলিয়া। 'ছোট বেলায় কত গেছি। তাড়াহুড়ো না করলে আর পথ চেনা থাকলে এটা কোনও ব্যাপারই নয়।'

'শুনে দারুণ ভাল লাগল,' বলল রানা, ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে ফেলল ট্রাক 'এখন তোমাদের হেঁটেই ফিরতে হবে।' কথা শেষ করেই ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামল ও, হ্যাঁচকা টানে সঙ্গে অ্যাঞ্জেলিয়াকেও বের করে এনেছে। রাস্তার পাশে এক ঝাড় ছোট পাইনের গাছ, ঝোপ বললেই হয়, সেদিকে অ্যাঞ্জেলিয়াকে ঠেলে দিল ও। চিৎকার করে আপত্তি জানাল মেয়েটা, ঠেলা সামলাতে না পেরে গাছগুলো জড়িয়ে ধরল। ওয়ালথারটা বের করে গিটানোর দিকে তাক করে নাড়ল রানা, কিছু বলতে হলো না, আস্তে করে ওপাশের দরজা খুলে নেমে পড়ল গিটানো। বাতাসে ভাসছে ইটালিয়ান গালাগালি। তুফান ছোটাচ্ছে ভাই-বোন ট্রাকে উঠে গিয়ার দিয়ে সামনে বাড়ল রানা, রিয়ারভিউ মিররে দেখল দু'হাত মুঠো করে বাতাসে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ছুটে আসছে অ্যাঞ্জেলিয়া। গতি বাড়াল ও. মেয়েলি কণ্ঠের চেঁচামেচি ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে পেছনে, একটা বাঁক নিতেই চোখের আড়ালে চলে গেল অ্যাঞ্জেলিয়া।

আকাশে ভোরের অস্পষ্ট আভাস। এবার কোথায় যাওয়া যায় ভাবল রানা। একটা চিন্তা বারবার করে আসছে মাথায়। ও যাবার পরে যদি প্রফেসরের মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটে থাকে, তাহলে ঘটেছে ওর নাকের ডগায়। এ সম্ভব নয়, নিজেকে বলল রানা, প্রতিটা মুহূর্ত অনুভব করছে, যা ঘটা সম্ভব ছিল না তা-ই ঘটেছে। এখন ওর আইএসএস মীটিঙের তালিকাগুলো দরকার। আগের কয়েকটা মীটিঙে কারা-কারা উপস্থিত ছিল তার একটা তালিকা ছাড়া কাজে এগোনো যাবে না

ঠিক করেছে, প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবে ও, কোথাও না কোথাও একটা সূত্র মিলতে বাধ্য।

ট্রাকটা লক্কড় মার্কা হলেও গোলমাল না করে ছুটে চলেছে বেশ দ্রুত। ট্যাঙ্কে ফুয়েলও আছে যথেষ্ট। সূর্য ওঠার পরও একটানা চালিয়ে গেল রানা, রোমে পৌঁছে একটা সাইড স্ট্রীটে ট্রাক রেখে মাইল দুয়েক হেঁটে রাফায়েলো নামের একটা কমদামী হোটেলে উঠল। কারাবিনিয়ারি ট্রাকের নাম্বার-প্লেট দেখে ওটা মালিককে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে।

ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসছে ওর। ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে উঠে ঢাকায় ফোন করল সোহেলের নাম্বারে, জানাল কোথায় উঠেছে ও, কোনও নতুন খবর থাকলে জানাতে বলে রেখে দিল ফোন। এবার হালকা কয়েকটা ব্যায়াম সেরে গরম পানিতে গোসল করে লাঞ্চ সেরে নিল, তারপর সেঁটে ঘুম দিল আবার। ঘুম ভাঙল বিকেলে। রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জানল ওর জন্যে কোনও মেসেজ নেই। তারমানে নতুন কিছু জানাবার মত নেই সোহেলের।

দ্রুত বিজ্ঞানীদের একটা লিস্ট পাবার সহজ উপায়টাই বেছে নিল ও, যোগাযোগ করল ডক্টর ক্রিসের নাম্বারে, জুরিখে। দু'বার রিং হতেই ক্রেডল তুললেন ক্রিস, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, রানার হ্যালো শুনেই গলা চিনে ফেললেন। কুশল বিনিময়ের পর রানা বলল, 'গত সাতটা মীটিঙে কারা কারা উপস্থিত ছিল তার একটা তালিকা দরকার আমার। গুরুত্বপূর্ণ হোক, গুরুত্বহীন হোক—সবার নাম জানতে চাই। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

ওপ্রান্তে খানিক নীরবতা, তারপর কার্ল ক্রিসের কণ্ঠ ভেসে এল, কেমন যেন আড়ষ্ট, 'দেখুন, মিস্টার রানা, আইএসএসের নিয়ম নেই মীটিঙে কারা ছিল তার লিস্ট দেয়ার।' গলাটা এবার একটু কড়া শোনাল। 'জানতে পারি কি, কেন হঠাৎ এই অনুরোধ?'

জবাব এড়িয়ে গেল রানা। 'আপাতত বলতে পারছি না কেন, ডক্টর ক্রিস। তবে আপনার আপত্তির কারণটাও বুঝতে পারছি না। মীটিং যখন হয় তার আগে পাবলিকলি আপনারা তালিকা প্রকাশ করেন। এখন তালিকা জানাতে অসুবিধে কিসের!'

'আসলে আমাদের লিস্ট কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না,' বলল ক্রিস। 'আপনি যা বলছেন, সেটা করতে হলে, মানে মীটিংগুলোয় উপস্থিত সবার নাম জানাতে হলে বেশ সময় লাগবে।'

'আমি জানি আপনার কাছে কমপ্লিট লিস্ট আছে, মিস্টার ক্রিস,' নিজের গলায় নিজেই অবাক হলো রানা, রেগে উঠছে ও। 'নিজেদের রেকর্ড ঠিক রাখার জন্যেই লিস্ট থাকবে। আপনি যদি লিস্টটা না দেন তাহলে আমাকে বাধ্য হয়েই

আইএসএস গভর্নিং বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ কবতে হবে, সেটা হয়তো আপনি চাইবেন না।'

গলা নরম হয়ে গেল সেক্রেটারির। 'আমাকে আপনি ভুল বুঝছেন, মিস্টার রানা। গভর্নিং বোর্ডে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। আমি সবসময়েই সরকারী লোকদের সাহায্য করে থাকি, তাদের উদ্দেশ্য না জানলেও।' রানা টোপটা গিলল না। ও সরকারী লোক না বেসরকারী তা নিয়ে কার্ল ক্রিস যত খুশি ভাবতে থাকুন।

'তাহলে দয়া করে রোমে হোটেল রাফায়েলোতে এয়ারমেইল করে দেবেন তালিকাগুলো,' বলল রানা। 'আমি হোটেল রাফায়েলোতে উঠেছি।'

'অবশ্যই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তালিকা পেয়ে যাবেন। আশা করি আবার আমাদের দেখা হবে, মিস্টার রানা।' ওপ্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন কার্ল ক্রিস।

ছোট একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার সারল রানা, রোমের চমৎকার পরিবেশ মোটেই উপভোগ করতে পারল না। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। কোনও সূত্রই নেই সামনে। সোজা হোটেলে ফিরে ঘুম দিল। জাগতে হলো দু'ঘণ্টা পরই। কার্ল ক্রিস আইএসএস মীটিঙের তালিকা পাঠিয়েছেন, হোটেলের বয় সেটা নিয়ে এসেছে।

বিছানার ওপর কাগজগুলো বিছিয়ে চোখ বোলাল রানা। প্রতিটা নাম নিজে একটা কাগজে টুকল। পরদিন সকালটাও কাটল ওর একই কাজে। মেঝেতে এখন ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট কাগজের অসংখ্য দোমড়ানো টুকরো। হতাশ হতে হলো ওকে। গত সাতটা মীটিঙের তালিকা পাঠিয়েছেন ডক্টর ক্রিস। আইএসএসের প্রতিটা মীটিঙে হাজির ছিলেন না সব বিজ্ঞানী। রানা আগের ধারণাটা বাতিল করে দিল। কোনও একজন বিজ্ঞানী গত সাতটা মীটিঙে রোগ ছড়াননি। সে সুযোগ ছিল না।

আবার কাগজগুলোয় চোখ বুলাল রানা, জেদ চেপে গেছে। একটা কিছু ভুল হচ্ছে ওর, হতেই হবে, নইলে ঠিকই কোনও সূত্র পাওয়া যেত। কয়েকটা মীটিঙে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী পরপর উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আটটা মীটিঙে কেউ পরপর থাকেননি।

এবার রানার চোখে পড়ল ব্যাপারটা। মাত্র একজন আছে যে আটটা মীটিঙেই উপস্থিত ছিল। কার্ল ক্রিস। কার্ল ক্রিস, আইএসএস সেক্রেটারি, তিনিই একমাত্র লোক যে সবগুলো মীটিঙে হাজির ছিলেন।

কাউচে হেলান দিয়ে বসল রানা, ভাবছে। ক্রিস যদি দায়ী হয়ে থাকে তাহলে অনেক কিছু মিলে যায়। সুইজারল্যান্ডের লোক সে। ওখানে ইহুদি আছে প্রচুর। কার্ল ক্রিস নিজেও সম্ভবত ইহুদি। মোসাদের এজেন্ট হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে

তার। শক্তসমর্থ লোকটার হাসিখুশি ব্যক্তিত্বময় চেহারাটা চোখে ভাসল ওর। ক্রিস যদি মোসাদের সঙ্গে জড়িত থেকে থাকে তাহলে কর্তা গোছের কেউ হবার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে প্রথম থেকেই সে জানে রানা তাকেই খুঁজছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ছাদের দিকে ধোঁয়া ছুঁড়ল রানা। ওর ধারণা সত্যি হলে রহস্য সমাধানের উপায় পেয়ে গেছে ও। ঠিক করে ফেলল, জুরিখে যেতে হবে, খোঁজ নিতে হবে কার্ল ক্রিসের ব্যাপারে। লোকটাকে সামনাসামনি পেলে ভাল হয়, বাজিয়ে দেখা সহজ হবে।

সাত

আকাশটা ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। রোমের আকাশ এমন কুয়াশা কাটিয়ে উঠতে দু'তিনদিন সময় নেয়। যাত্রার জন্যে আবহাওয়াটা মোটেও সুবিধের নয়, তবু দেরি না করে হোটেল থেকে চেক আউট করল রানা। আধঘণ্টা ট্যাক্সি নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরল, নিশ্চিত হলো কেউ ওকে ফলো করছে কিনা। যখন বুঝল করছে তখন আর দেরি না করে সোজা চলে এলো রেল স্টেশনে, রোম-জুরিখ এক্সপ্রেস ট্রেইনের টিকেট কেটে উঠে বসল। বিশ মিনিট পর ছাড়ল ট্রেইন।

রানার কম্পার্টমেন্টটা ট্রেইনের মাঝামাঝি। ট্রেইনটা নামেই এক্সপ্রেস, আসলে লোকালকেও হার মানায়। গা নড়াতে দেরি তো করলই, চলতেও শুরু করল শামুকের গতিতে। রোমের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে তখন সন্ধের আলোআঁধারির খেলা শুরু হয়েছে। রানার কম্পার্টমেন্টটা স্লীপিং কম্পার্টমেন্ট, চেকার এসে ওর পাসপোর্ট পরীক্ষা করে বার্থ ঠিক করে দিয়ে গেল। আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল শহরের হলদে বাতিগুলো। গতি বাড়ছে ট্রেইনের। এক সময় তুমুল গতিতে ছুটতে শুরু করল। তবে কোনও কোনও স্টেশনে যখন থামছে, তখন এত দেরি করছে যে বিরক্তি এসে যায়। শুয়ে পড়ল রানা, ট্রেইনের আরামদায়ক দুলুনিতে ঘুম আসতে দেরি হলো না। ঘুম যখন ভাঙল, সকাল হয়ে গেছে, ট্রেইন চলে এসেছে সুইস বর্ডারের কাছে, বেলিযোনায়। ডাইনিং কারে গিয়ে কফি আর স্যান্ডউইচ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিল রানা।

বাইরের দৃশ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। পাহাড়ী অঞ্চল, ছোট ছোট সবুজ টিলা, তার পেছনে সফেদ বরফে গা মুড়ে আকাশে মাথা উঁচু করে আছে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, সকালের লাল সূর্যের কিরণে সাতরঙা আলোর ঝিলিক ছড়াচ্ছে। আগের মত এখন আর রেল লাইনের ধারে লরেল ফুটে নেই, সে জায়গা দখল

করেছে জলপাই গাছ, সিডার আর আঙুরের গুচ্ছ। দক্ষিণ ইটালির আরামদায়ক নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বদলে গেছে, শুকনো বাতাসে কনকনে শীতের আভাস।

নাস্তা সেরে নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরছে রানা, প্রায় পৌঁছে গেছে, এমন সময়ে ডাকল লোকটা। ঘুরে তাকাল রানা, দেখল টাকমাথা এক মাঝবয়সী লোক, মাঝারি উচ্চতা, হাতে সোনার সিগারেট কেস, এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'এক্সকিউয মি, সেনিয়র,' ভারী টানে ইটালিয়ান ভাষায় বলল লোকটা। 'ম্যাচ হবে?'

কোটের পকেট থেকে ম্যাচ বের করে বাড়িয়ে দিল রানা। লোকটা সামনে ঝুঁকল ওটা নিতে, এবার ইংরেজিতে ধীরে ধীরে বলল, 'নড়বে না, মাসুদ রানা। দুটো পিস্তল তাক করা আছে তোমার ওপর। একটা পেছনে, আরেকটা আমার কোটের পকেটে।' বাম হাত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে সে।

পকেটের ওপর দিয়েও রিভলভারের নলটা চিনতে পারল রানা, নড়ল না। আস্তে করে ঘাড় ফেরাল, চোখের কোণে দেখল করিডরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে অন্য লোকটা।

'কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ো,' নির্দেশ দিল টাকমাথা। 'চালাকির চেষ্টা কোরো না।'

পেছনে আরও দু'জন ষণ্ডামার্কা লোকের উদয় হয়েছে, চোখের কোণে দেখল রানা, এগিয়ে আসছে তারা ভালমানুষের মত নির্দেশ পালন করল রানা, কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ঠিক পেছনেই আছে টাকমাথা। তার পেছনে, দু'পাশে আসছে অন্য তিনজন। কম্পার্টমেন্টে ঢুকতেই দ্রুত দক্ষ হাতে সার্চ করা হলো ওকে, ওয়ালথারটা কেড়ে নেয়া হলো। বাহুর ভেতরের দিকে চামড়ার খাপে পোরা ছোরাটার হদিস পায়নি। দক্ষ লোকও তাড়াহুড়ো করলে ছোরাটা সহজে খুঁজে পাবে না এমন ভাবে রাখে ও ওটা।

'তুমি তাহলে আমার নাম জানো,' হাসির ভঙ্গি করল রানা, তাকিয়ে আছে টাকমাথার দিকে। এ ব্যাটাই একটু আগে ভদ্রলোকের মত ম্যাচ চাইছিল, এখন চেয়ে আছে ক্রূর চোখে।

'রানা। মাসুদ রানা।' ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল সে। 'বিসিআই। কোড নেম এম আর নাইন।'

'আর তোমরা মোসাদের এজেন্ট।'

প্রত্যেককে মেপে নিয়েছে রানা। দশাসই লোকগুলো মোসাদের ফিল্ড এজেন্ট। টাকমাথা সম্ভবত তাদের বস্। রানাকে তাকাতে দেখে হাসল সে। 'তোমার ব্যাপারে সবই জানি আমরা, মাসুদ রানা। ব্যক্তিগত ভাবে আমি তোমাকে পছন্দই করি। লন্ডনে আমাদের কয়েকজনকে শেষ করে দিয়ে নিজের যোগ্যতা

প্রমাণ করেছ তুমি। মোসাদ? ঠিকই বলেছ। মোসাদ আমরা। আমি ক্যাপ্টেন রকোভিচ ফ্র্যাঙ্ক, ইউরোপ ডিভিশনের অ্যাসিস্টেন্ট হেড।'

'আর কার্ল ক্রিস? সে আসল মাথা?'

'ঠিক ধরেছ। তবে অনেক দেরিতে।'

দ্রুত মাথা খেলাচ্ছে রানা। লোকগুলো আকাশ থেকে পড়ল নাকি! হয় এরা মাত্রাতিরিক্ত দক্ষ, নয়তো অসতর্ক হয়ে পড়ছে ও। ওর পেশায় অসতর্কতার একটাই পরিণাম–মৃত্যু।

'অনুসরণ করবে তা জানতাম, কিন্তু এভাবে আচমকা ধরে ফেলবে ভাবতেও পারিনি আমি,' স্বীকার করল রানা।

'অনুসরণ করিনি,' বলল রকোভিচ 'জানতাম অনুসরণ করলে পেছনে লেজুড় আছে টের পেয়ে যাবে তুমি। আমাদের সুবিধে করে দিয়েছে আবহাওয়া। কুয়াশার কারণে এয়ারপোর্টকে হিসেবের বাইরে রাখতে পেরেছি। যদি তুমি ডক্টর ক্রিসের পেছনে ছোটো তাহলে মাত্র দুটো উপায়ই ছিল, হয় গাড়িতে যাওয়া, নয়তো ট্রেইনে করে। প্রতিটা ট্রেইনের ওপর নজর রাখছিল আমাদের লোক। তুমি হোটেল ত্যাগ করতেই রেডিয়োতে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে একজন। আমাদের আরেকজন তোমাকে দেখেছে জুরিখের ট্রেইনে উঠতে। আমরা উঠেছি গত স্টেশনে।'

হাসছে লোকটা, চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। রানার ইচ্ছে হলো এক ঘুসিতে ইহুদি ব্যাটার চেহারার মানচিত্র পালটে দেয়। নিজেকে সামলে রাখল, এখন আক্রমণ করলে নিশ্চিত মৃত্যু।

'লন্ডনে সেই মহিলার ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, সময় নষ্ট করতে চাইছে, প্রতি মুহূর্তে ভেবে চলেছে কিভাবে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে।

'মারিয়া গোল্ডামেয়ার?' আবার হাসল ক্যাপ্টেন ফ্র্যাঙ্ক। 'আনফরচুনেট কেস। আমাদের কাছে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মহিলা, সরাতে পারছিলাম না। তোমার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে পরোক্ষ ভাবে তাকে উৎসাহিত করা হয়। টোপ গেলে সে, কয়েকজন বিজ্ঞানীকে দেশের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখে জীবনের শেষ ভুলটা করে। মিস্টার ক্রিসের নির্দেশে তাকে স্রষ্টার সঙ্গে দেখা করতে পাঠানো হয়েছে।'

'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ। তোমাকেও সেখানেই পাঠানো হবে, মাসুদ রানা।' এবার হিব্রু ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল ওরা। মোটামুটি ভালই বোঝে রানা হিব্রু। বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হলো না। কোন্ উপায়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে রানাকে শেষ করা যায় তা নিয়ে আলাপ চলছে। টাকমাথা যেভাবে গুলি করে

মারতে চাইছে তাতে হাতে বেশি সময় নেই, বুঝতে পারছে রানা। তবে আপাতত খানিকক্ষণের জন্যে ও নিরাপদ। একটা গ্রাম পাশ কাটাবার সময় গতি কমিয়েছে ট্রেইনটা।

ট্রেইনের কম্পার্টমেন্টটা দেখল রানা, ভাবছে কি করা যায়। সরু কম্পার্টমেন্ট, দু'পাশে বার্থ। নড়াচড়ার তেমন একটা সুযোগ নেই। হাত উঁচু করে আছে ও, ছোরাটা বের করে কোনও লাভ হবে না। হয়তো একজনকে শেষ করতে পারবে ও, কপাল ভাল হলে দু'জনকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরতেই হবে। পরিস্থিতিটা মোটেই অনুকূল নয়। বডি বিল্ডারের মত দু'জন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রকোভিচ ওর সামনে দাঁড়ানো। চার নম্বর লোকটা ডানদিকে, খানিক দূরে।

আলোচনা শেষ হলো। রকোভিচের কথাই থাকছে, কোনও ঝুঁকি নেয়া হবে না, এখানে এই কম্পার্টমেন্টেই গুলি করে মারা হবে ওকে, তারপর লাশটা ফেলে দেয়া হবে। পরবর্তী স্টেশনে নেমে যাবে সবাই।

চট করে জানালার দিকে তাকাল রানা। ট্রেইনের আওয়াজ বদলে গেছে, ফাঁপা শোনাচ্ছে, একটা স্টীলের ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে এখন ট্রেইন। অনেক নিচে নীল পানি দেখতে পেল রানা। বড় বেশি নিচে। কিন্তু বুঝতে পারছে, এটাই ওর বাঁচার শেষ সুযোগ। রিভলভার তাক করল রকোভিচ। আস্তে আস্তে হাত আরও ওপরে তুলল রানা, হাতের কাছেই ইমার্জেন্সি ব্রেক কর্ড, টান দিল ওটা ধরে, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে গতি কমে গেল ট্রেইনের। রানা ছাড়া আর সবাই কম্পার্টমেন্টের বামদিকে ছিটকে পড়ল। এই সুযোগটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল রানা, জানালা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল ও, মুঠি পাকানো দু'হাত সামনে বাড়ানো।

শূন্যে উড়াল দিল ওর শরীর। ঝনঝন করে ভেঙে গেল জানালার কাঁচ। হাতে আর কপালে কাঁচের টুকরো গেঁথেছে, টের পেল রানা, ব্রিজের রেইলিঙের ওপর দিয়ে ছিটকে পড়ল বাইরে, নামতে শুরু করল আকাশ থেকে ছেড়ে দেয়া একটা ভারী পাথরের মত। শরীর খাড়া করার সুযোগ পেল না, চোখের কোণে দেখতে পাচ্ছে থেমে দাঁড়িয়েছে ট্রেইন। বাতাসে কাত হয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে পানিতে আছড়ে পড়ল ওর দেহ। যেন অনেক ওপর থেকে কংক্রিটের ওপর পড়েছে। সারা শরীর প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল, মনে হলো একটা হাড়ও আর আস্ত নেই। পানিতে ডুবে গেল ও, হাঁসফাঁস করতে করতে মাথা জাগাল তারপর।

আচ্ছন্ন মনে হলো নিজেকে। শরীরে তীব্র ব্যথা। হাত আর মুখের কাটাগুলো জ্বলছে। কপাল ভাল, তীর বেশি দূরে নয়, সাঁতার কাটতে শুরু করল ও অবসন্ন দেহে। পাথুরে তীরে উঠে পেছনে তাকাল একবার, মাথার ঝাপসা ভাবটা কেটে যাওয়ায় ব্যথা কত বেশি সেটা টের পাচ্ছে। হাড়-মাংস আলাদা হয়ে গেছে যেন।

শরীর টেনে-টেনে সামনে গাছের সারির দিকে এগোল রানা। মাত্র কয়েক পা, তারপরই মনে হলো বাঁ উরুতে লোহার উত্তপ্ত পেরেক ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। আচমকা মনে হলো মুগুরের বাড়ি পড়েছে, পাশ ফিরে গেল ও বুলেটের ধাক্কায়। বিস্ফোরণের আওয়াজটা শুনতে পেল। দেখল ব্রিজে থেমে থাকা ট্রেইন থেকে নেমে এসেছে সেই চারজন, দৌড়ে আসছে ফুটপাথ ধরে, এক্ষুণি নামতে শুরু করবে তীর বেয়ে। তীরে ও যেখানে আছে সেখানে আসতে সময় লাগবে ওদের। রানার পায়ের কাছে পাথরের কুচি ছিটাল আরেকটা বুলেট। পায়ের দিকে তাকাল রানা। ·৪৫ ব্যবহার করছে মোসাদের এজেন্টরা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, প্যান্ট ভিজে গেছে। একটার পর একটা অসহ্য ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ছে যেন।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, পা টেনে টেনে দৌড় দিল গাছের সারির দিকে, আহত পা-টা মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে চাইছে না, মনে হচ্ছে যেন রাবারের তৈরি, এক্ষুণি ভাঁজ হয়ে যাবে। বুলেটের চেয়ে পানিতে আছড়ে পড়ার আঘাতটাই বেশি অনুভব করছে ও। কেমন যেন ঘোলা হয়ে আসছে মাথা। গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। আর এগোতে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে পড়লে ভাল লাগত। চোখের সামনে কাঁচা-পাকা কুঁচকানো ভ্রূ দেখতে পেল ও। জলদগম্ভীর সেই কণ্ঠ, যে কণ্ঠের নির্দেশে হাসিমুখে মরতে পারে ও, সেটা যেন বলছে, পালাও রানা! পালাও!

হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ল রানা, চার হাত-পায়ে এগোল গাছের সারির দিকে, রক্তক্ষরণে ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে শক্তি। একবার পা-টা দেখল। মনে হলো রক্তলাল একটা কম্বল। বুঝতে পারছে, রক্তের একটা মোটা রেখা পেছনে ফেলে যাচ্ছে ও, মোসাদের এজেন্টরা সহজেই ওকে খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে।

দ্রুত হামাগুড়ি দিচ্ছে রানা, গাছের সারি হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল, সামনে একটা খেত। কয়েকটা গরু চরছে খেতের পাশে। মাথা উঁচু করে তাকানোটাও যেন একটা অত্যাচার। ঘোলা হয়ে আসছে দৃষ্টি। সবুজ খেতের ওপারে একটা ফার্মহাউস আর বার্ন। মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে উঠে দাঁড়াল রানা, টলতে টলতে এগোল, বারবার মাথা ঝাঁকাচ্ছে দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্যে। একবার ওই বার্নে পৌঁছোতে পারলে হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারবে ও। আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা, হাসল। লুকানো সম্ভব নয়, রক্তের রেখা ওকে ধরিয়ে দেবে। এভাবেই তাহলে শেষ হয়ে গেল ওর জীবন? গাছের সারির পাশ দিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ও, হঠাৎ শুনতে পেল কচি কণ্ঠের চিৎকার। খুব কাছেই কোথাও আছে বাচ্চাটা, নাকি ভুল শুনছে ও? অনেক দূর থেকে ভেসে এল না আওয়াজটা?

ধপ করে বসে পড়ল রানা, চোখের সামনে দুলছে পৃথিবী। শুয়ে পড়ল। দেখল ওর ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা মেয়েটা, বড় বড় চোখে ভয় নিয়ে

ওকে দেখছে। সোনালী চুল, বয়স বড়জোর দশ হবে। চোখের কোণে মেয়েটারই বড় একটা সংস্করণ দেখতে পেল, এগিয়ে আসছে বার্নের দিক থেকে। মাথা তোলার চেষ্টা করল, পারল না। এখনও জ্ঞান আছে ওর, কিন্তু বারবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি, মাথাটা ঘুরছে বনবন করে চোখের সামনে ভাসছে সাদা কুয়াশার মেঘ। টের পেল, দুটো হাত ওর কাঁধ ধরে তোলার চেষ্টা করছে। চোখের সামনে মহিলার মুখটা দেখতে পেল। নিষ্পাপ, মিষ্টি একটা চেহারা। ওকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে মহিলা।

'না…না…' মাথা নাড়ল রানা। 'একটা হুইলবারো… হুইলবারো আনুন।'

ঘাসে রানার মাথা নামিয়ে রাখল মহিলা, রানা শুনতে পেল মেয়েকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে।

আর কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছে না রানা। শুধু টের পেল ওকে তোলা হচ্ছে একটা কিছুতে। ঘন-ঘন ঝাঁকি খেল ওর দেহ, মনে হলো মরে যাবে ব্যথায়। পলকের জন্যে দৃষ্টি পরিষ্কার হলো, দেখল ফার্মহাউসের কাছে ওকে নিয়ে এসেছে মহিলা, বাচ্চা মেয়েটির উদ্বিগ্ন মুখটা দেখতে পেল, ঝুঁকে আছে ওর ওপর।

'ওরা আসছে,' ফিসফিস করল রানা। 'ওরা আমাকে মেরে ফেলতে আসছে।' আর কিছু বলতে পারল না, চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়েছে রানা।

অচেতনতা ঘুমে পরিণত হয়েছিল, কয়েক ঘণ্টা পর ভাঙল রানার ঘুম, অনুভব করল, শরীরের ব্যথা কমেনি। অন্ধকার একটা ঘরে আছে ও। বাতাসে গুমোট একটা ভাব। বোধহয় কোনও সেলারে রাখা হয়েছে ওকে। চুপ করে শুয়ে থেকে মাথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। হাত দিয়ে দেখল, একটা সিঙ্গল খাটে শুয়ে আছে, গায়ে একটা কম্বল ছাড়া আর কিছু নেই। স্ট্রেচ করতে গিয়ে ব্যথায় আরেকটু হলে কাতরে উঠেছিল। প্রতিটা মাংসপেশি ব্যথা করছে। বাঁ পায়ে একটা আলাদা ধরনের ব্যথা। হাত দুটো ছিলে গেছে, ব্যান্ডেজ করে রাখা হয়েছে।

গভীর করে দম নিল রানা, চুপ করে শুয়ে আছে। বুঝতে পারছে ট্রেইন থেকে লাফ দেয়ার ধাক্কা সামলে নিতে সময় লাগবে ওর। শুনতে পেল একটা দরজা খোলার শব্দ। দরজাটা সীলিঙে। তীব্র একটা চৌকো হলদে আলো এসে পড়ল ঘরে, দেখা গেল সিঁড়ির ধাপগুলো। সেই মহিলা নামছে সিঁড়ি বেয়ে, হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। পেছনে সেই বাচ্চা মেয়েটাও আছে, পরনে নাইটগাউন।

'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে,' বলল মহিলা, ইংরেজিতে সামান্য সুইস অ্যাকসেন্ট। 'ভাল।'

জ্ঞান হারানোর আগে ঠিকই দেখেছে, বুঝতে পারল রানা, মহিলা সত্যি মিষ্টি দেখতে। চট করে ওর মায়ের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

পরমুহূর্তে রাঙার মা'র ফোকলা হাসি। কোথায় যেন মিল আছে এই ভিনদেশী সুইস মহিলার সঙ্গে ওদের। মাতৃত্ব? হবেও বা।

সোনালী চুল মহিলার, মুকুটের মত করে বেঁধেছে। গোল মুখ, রসাল পুরুষ্টু ঠোঁট, পরনে দীর্ঘ স্কার্ট আর গাঢ় নীল ব্লাউজ। ব্লাউজটা হালকা নীল মায়াময় চোখের সঙ্গে চমৎকার ম্যাচ করেছে।

'কেমন লাগছে এখন?' জিজ্ঞেস করল মহিলা, খাটের পাশে কাঠের একটা টেবিলে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে ঝুঁকে দেখল ওকে। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারও আছে, বসল সেটায়।

মৃদু হাসল রানা, বলল, 'ব্যথায় মনে হচ্ছে আমি বারো তলা দালানের ছাদ থেকে পড়ে গেছি।'

'আপনি ঠিক তা-ই করেছেন, মিস্টার মাসুদ,' মহিলাও হাসল। 'তবে পড়ে যাননি, লাফ দিয়ে নেমেছেন।' গলার স্বরটা এবার দুঃখপ্রকাশের মত শোনাল। 'আমি আপনার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেছি। ওই লোকগুলো বলল আপনি একজন পলাতক বন্দি, ট্রেইন থেকে ঝাঁপিয়ে পানিতে পড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন।' শিউরে উঠল মহিলা, হঠাৎ করে মনে হলো অনেক দূরে চলে গেছে তার দৃষ্টি। 'ভয় লাগে ওদের দেখে। যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতেও বাধবে না! আমি জানি ওরা ফিরে আসবে।'

'কি করে শিওর হচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আগেও ওদের মত পশুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার দুর্ভাগ্য হয়েছে আমার।' দেয়ালের দিকে তাকাল মহিলা, চোখের কোণে টলটল করছে অশ্রু। 'আমার স্বামী ইন্টারপোলে ছিল। একদিন এদের মত একদল লোক এল, ধরে নিয়ে গেল ওকে। আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না ওর। লাশটাও পাওয়া যায়নি।'

'আমি দুঃখিত। আপনি ওদের কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেননি?'

'না। পলাতক বন্দি কখনও আপনার মত পাসপোর্ট আর পরিচয়পত্র বহন করে না। জানি না ওরা কেন আপনাকে খুঁজছে, কিন্তু আপনি আর যাই হোন কোনও আসামী নন এটা আমার মনে হয়েছে।'

'এই দেখুন কি অভদ্র লোক আমি,' বলল রানা, 'আপনার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করিনি।'

'ইরিনা গ্রুটস্কা।' মেয়েটাকে দেখাল। 'ও বার্থা, আমার মেয়ে।' উঠে দাঁড়াল। 'চলো বার্থা, তোমার ঘুমের সময় হয়ে গেল।'

মহিলা মেয়েকে নিয়ে চলে যাবার পর চোখ বন্ধ করল রানা, ঘুমিয়ে পড়ল কয়েক সেকেন্ড পর। আবার ওর ঘুম ভাঙল ট্র্যাপ ডোর খোলার আওয়াজে। এবার একাই এসেছে ইরিনা। পোশাক বদলে এসেছে, ঘুমের আগে একবার রানাকে

দেখে যাবে। ওপেক একটা নাইটগাউন তার পরনে, কাঁধে ঝুলছে একটা শাল। দীর্ঘ এলো চুল পিঠে ছড়িয়ে আছে। প্রশান্ত, কোমল, স্নেহময়ী, ব্যক্তিত্বপূর্ণ। রানার মনে হলো ভার্মিয়ার পেইন্টিং থেকে নেমে এসেছে মহিলা।

হাতে একটা পট। ভেতর থেকে একটা চামচের লেজ বেরিয়ে আছে। পটে সুপ। অপূর্ব স্বাদ। চেয়ারে বসে রানার খাওয়া দেখছে ইরিনা। ধীরে-ধীরে খাচ্ছে রানা। ওর সুবিধের জন্যে পিঠের নিচে আরেকটা বালিশ রাখল মহিলা।

'আপনার পোশাক সব নষ্ট হয়ে গেছে,' বলল। 'আমার স্বামী আপনার মতই লম্বা ছিল। মনে হয় ওর পোশাক আপনার গায়ে হবে। অবশ্য এখনই কোনও কাজে আসবে না ওগুলো আপনার। সুস্থ হতে বেশ সময় নেবেন আপনি।' একটু দ্বিধা করল ইরিনা, ঠোঁটে তার বিষাদমাখা মলিন হাসি। বলল, 'আশা করি আপনি অপ্রস্তুত হননি আমি আপনার পোশাক খোলায়।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, 'আপনি একাই ফার্মটা চালান? আর কোনও লোক তো দেখলাম না।'

'ছোট ফার্ম। একাই চালাতে পারি। চাষের সময় হলে লোক ভাড়া করি।'

কেন দায়িত্ব মনে করছে নিজেও বলতে পারবে না রানা, ও জিজ্ঞেস করল, 'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?'

একটু দ্বিধা করল ইরিনা, তারপর বলল, 'করুন।'

'আপনি কি একাই বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার কথা ভাবছেন?'

'কেন?' হাসল ইরিনা। 'আমার তো কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তাছাড়া ইউরোপের পুরুষরা বাচ্চা আছে এমন মেয়েদের বউ হিসেবে পছন্দ করে না। হয়তো কোনও একদিন বিয়ে করব, যদি পছন্দমত কাউকে পাই, আর সে যদি রাজি হয়।'

'নিশ্চয়ই পছন্দ মত কাউকে পাবেন। সে কৃতজ্ঞ হয়ে যাবে আপনাকে পেলে।' অন্তর থেকে কথাটা বলেছে রানা। এবার কাজের কথায় এল। 'ওরা যদি ফিরে আসবে বলে মনে করেন তাহলে এখান থেকে আগেই চলে যাওয়া উচিত আমার।'

'যাওয়ার তুলনায় আপনি এখনও অনেক দুর্বল,' আপত্তির সুরে বলল ইরিনা। 'তাছাড়া এখানে ওরা আপনাকে খুঁজে পাবে না। আপনি এখানে নিরাপদ।'

উঠে দাঁড়াল মহিলা। 'আমি আপনার পায়ের ড্রেসিংটা বদলাব এখন।' ঘরের উল্টোপাশে রাখা একটা কাঠের সিন্দুক থেকে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো বের করল, কাজ শুরু করল সাবধানে। তাতেও ব্যথা কম লাগছে না। ড্রেসিং হয়ে যেতে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল রানা। সাহস দিয়ে হাসল মহিলা, তারপর লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল সেলার থেকে। চোখ বুজল

রানা, ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে।

সকালে বেশ বেলা করে ভাঙল ঘুম। আবছা ভাবে শুনতে পেল, ওপরের ঘরে কারা যেন কথা বলছে। উঠে বসল ও। শরীরের ব্যথা প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু পা-টা এখনও আড়ষ্ট। একটু পর কথা থেমে গেল, ট্র্যাপ ডোর খুলে নেমে এল ইরিনা গ্রুটস্কা, গম্ভীর চেহারা। বলল, 'আমি বলেছিলাম না ওরা ফিরে আসবে? দু'জন বাড়তি লোক নিয়ে এসেছিল। মোট ছ'জন।' আরেকবার ড্রেসিং বদলে দিল রানাকে। রানা দেখল চিন্তিত দেখাচ্ছে মহিলাকে, কিছুটা যেন ভীত। কাজ করতে করতে বলল, 'সব কয়টা ফার্ম হাউসে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে ওরা।'

'ওরা জানে আমি বেশি দূর যেতে পারব না,' বলল রানা। 'আমাকে যদি না পায় তাহলে ওরা আপনার কোনও ক্ষতি করবে না। আমার চলে যাওয়া উচিত।'

'আমাদের জন্যে চিন্তা করবেন না,' বলল ইরিনা। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারছি বলে ভাল লাগছে। ভাবতে ভাল লাগছে যে আমার স্বামীকে যারা মেরেছে তাদের মত একদল পশুর হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি।' একটু ইতস্তত করল। 'আচ্ছা, কেন খুঁজছে ওরা আপনাকে? আসলে কে আপনি?'

সত্যি কথাটা জানার অধিকার আছে মহিলার। তাছাড়া বললে কোনও ক্ষতিও নেই, কাজেই সত্যি বলল রানা। নিজের পরিচয় আর অ্যাসাইনমেন্টের কথা জানাল।

'এমন কিছুই হবেন আপনি, ভেবেছিলাম,' রানা থামতে বলল ইরিনা গ্রুটস্কা। সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে ঘুরে তাকাল। 'জেনে ভাল লাগল যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আপনাদের মত লোকরা আজও জীবনের ঝুঁকি নেয়।'

জবাব দিল না রানা, মৃদু হাসল। চলে গেল ইরিনা গ্রুটস্কা। আবার বিশ্রামের পালা। বিকেল নাগাদ নিজেকে প্রায় সুস্থই মনে হলো ওর। পা-টা অবশ্য এখনও সমস্যা করছে। গোল একটা ফুটো করেছে বুলেট। কপাল ভাল, কোনও শিরা বা রগ ছিঁড়ে নিয়ে যায়নি। দপদপ করছে ক্ষতস্থান, কিন্তু ও জানে দ্রুত ভরে উঠছে জখম।

বিকেলে মহিলা আবার যখন এল দুধ, রুটি আর পনির নিয়ে, রানা লক্ষ করল কেমন মলিন দেখাচ্ছে তাকে। 'ওরা আবার এসেছিল,' বলল রানা। আস্তে করে মাথা দোলাল ইরিনা গ্রুটস্কা।

'যেখানে আপনাকে হুইলবারোতে তুলেছিলাম সে পর্যন্ত রক্তের দাগ অনুসরণ করে এসেছে ওরা। ওখানে রক্তের দাগ শেষ হয়ে যাওয়ায় ওরা সন্দেহ করছে এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন আপনি।'

'আপনাকে সন্দেহ করছে ওরা,' বলল রানা। কোনও জবাব দিল না ইরিনা গ্রুটস্কা। জবাব দেয়ার কোনও প্রয়োজন হলো না। রানা স্থির করে ফেলল, এখানে

আর থাকবে না ও। ওর উপস্থিতি এমনিতেই মহিলা আর তার মেয়ের জীবনে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে এসেছে, সেই ঝুঁকিকে নিশ্চিত বিপদে পরিণত করা হবে এখানে থাকলে। সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল রানা, জানতে চাইল ফার্মের ব্যাপারে।

দুটো জিনিস নিয়ে ইরিনা গ্রুটস্কা বেশ গর্বিত। একটা হচ্ছে তার ট্র্যাক্টরের ফোর ডিস্ক প্লাউ, অন্যটা ফোক্সওয়াগেন প্যানেল ট্রাক। কথায় কথায় জানাল, ফার্ম করতে ভাল লাগে তার। বিশেষ করে প্লাউটা কেনার পর ফার্ম করা সহজ হয়ে গিয়েছে। সতেরো ফিট চওড়া প্লাউ, ক্ষুরধার চারটে ডিস্ক ব্লেড; সারাদিন কাজ করলে চাষ দেয়ার পর বড় একটা খেতের মাটি চাক ভেঙে মই দেয়ার কাজও সারা যায়। অনেকক্ষণ রানাকে সঙ্গ দিল মহিলা, তারপর চলে গেল বার্থাকে ঘুম পাড়াতে।

চুপ করে শুয়ে আছে রানা, ভাবছে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে। এবাড়িতে আর থাকা চলে না আবার যখন ওরা আসবে তখন হয়তো দুর্ব্যবহার করবে, নিজেরা পুরো সার্চ করতে চাইবে বাড়িটা। রানা এখানে থাকলে ইরিনা আর তার মেয়েকেও মরতে হবে ওর সঙ্গে। মোসাদ কোনও সাক্ষী রাখবে না। কিন্তু পা-টাকে আরও অন্তত একটা দিন বিশ্রাম দেয়া দরকার। বার্নে গিয়ে আশ্রয় নেবে, ভাবল রানা। সন্দেহ নেই, আগেই ভাল করে বার্ন খুঁজে দেখেছে রকোভিচের লোকরা। ওখানে আবার সহজে খোঁজার কথা নয়। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা যাবে বার্নে। পরিকল্পনা ঠিক করে চুপ করে শুয়ে থাকল, ঘুমাতে যাবার আগে আরেকবার ওকে দেখতে এল ইরিনা। দুয়েকটা কথা বলে চলে যাচ্ছে, এমন সময়ে মহিলার হাতটা আলতো করে ধরল রানা। 'একটা কথা বলব? নিজের মত করে বলতে চাই।'

'বলুন।'

'আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। সবকিছুর জন্যে।...আর একটা কথা, দেখবেন খুব ভাল কেউ আসবে আপনার জীবনে

'আপনার মতন?' হাসল ইরিনা, চোখে বিষাদ।

'না, আমি তো ভবঘুরে। আমার চেয়ে ঢের ভাল কেউ,' আন্তরিক কণ্ঠে কথাটা বলল রানা, হাতটা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল। সিঁড়িতে শুনতে পেল ইরিনার পায়ের আওয়াজ, দূরে চলে যাচ্ছে, ট্র্যাপ ডোরটা বন্ধ হয়ে গেল, মিলিয়ে গেল আলোর রেখা। চারপাশ এখন অন্ধকার। তবে রানা এখন ঘুমাবে না।

অপেক্ষা করছে ও, ঘুমিয়ে পড়ুক মা-মেয়ে, তারপর বেরিয়ে যাবে ও নিঃশব্দে মাঝরাত পেরিয়ে যাবার অনেকক্ষণ পর উঠল রানা, ইরিনার দেয়া পোশাক পরে কাগজপত্র, টাকা-পয়সা আর ছোরাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সিঁড়ি

বেয়ে উঠে ট্র্যাপ ডোর খুলে বেরিয়ে এল ফার্ম হাউস থেকে। বার্নটা বেশি দূরে নয়, বিশ কদম হেঁটে পৌঁছে গেল ওটার কাছে। দরজা খোলাই আছে। দোতলা বার্ন। ওপরে খড় রাখার ব্যবস্থা। একটা কাঠের মই আছে ওপরে ওঠার জন্যে। সাবধানে উঠল রানা, খড়ের একটা বেইল খুলে কিছুটা খড় ছিটাল ফাঁকা জায়গায় তারপর শুয়ে পড়ল। দেয়ালের পাশে ছোট একটা জানালা, চাঁদের কোমল আলো স্নান করিয়ে দিল ওকে। এবার রানা ঘুমাবে।

আট

ভোর হতে দেখল ও, পুবের আকাশে ধীরে-ধীরে ফুটে উঠল ধূসর আলোর রেখা। জানালা দিয়ে ফার্ম হাউসটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পাশেই সবুজ মাঠ। এক ধারে গভীর একটা খাদ, বাঁক নিয়ে চলে গেছে চোখের আড়ালে। বার্নের ভেতর নজর বুলাল ও। গরুর স্টলের উল্টোদিকে চকচক করছে বার্নের কোনায় দাঁড় করানো ফোর ডিস্ক প্লাউ। বার্নে খড়, গরু আর যন্ত্রটা ছাড়া আর কিছু নেই। চোখ বুজল রানা। টের পাচ্ছে, ব্যথা এক রকমের ঘুমের ওষুধ, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে ঘুমের জগতে।

নিচে নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে পাটাতনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রানা। ইরিনা গরু বাইরে নিয়ে যাচ্ছে চরাতে জানালা দিয়ে তাকাল, দেখল পিচ্চি বার্থা বাড়ি থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। কি খুঁজছে মেয়েটা বুঝতে পারল ও। রানা চলে গেছে সেটা টের পেয়েছে ওরা। ওর চিহ্ন খুঁজছে।

গরুগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল ইরিনা। চিৎ হয়ে শুলো রানা, যাত্রার আগে আহত পা-টাকে যতটা সম্ভব বিশ্রাম দিতে চাইছে। কয়েক মিনিট পর তীক্ষ্ণ চিৎকারটা শুনতে পেল ও, লাফ দিয়ে আধবসা হয়ে গেল খড়ের গাদায়। জানালার কিনারায় চোখ রাখল।

ক্যাপ্টেন রকোভস্কি আর তার লোক, মোট ছয়জন। দু'জন শক্ত করে ধরে রেখেছে ইরিনা গ্রুটস্কাকে। হাতের উল্টোপিঠে মহিলার গালে দ্বিতীয়বার চড় মারল রকোভস্কি। আরেকজন ধরে আছে বার্থাকে। রকোভস্কির অন্য হাতে ধরা রক্তাক্ত কাপড়গুলো দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল রানা, ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে ধারেকাছে ঘুরঘুর করছিল নিশ্চয়ই, রানার ব্যান্ডেজের কাপড়গুলো খুঁজে পেয়েছে। ইরিনা বোধহয় না পুড়িয়ে গার্বেজ পাইলে রেখেছিল ওগুলো। নিজেকে গাল দিল রানা, ইরিনাকে সতর্ক করা উচিত ছিল ওর।

'বল্, ডাইনী, কোথায় ও!' ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে রকোভিচের চেহারা। মুখটা টকটকে লাল। পাশ ফিরে নির্দেশ দিল, 'ন্যাঙটো করে মাগীকে বাঁধো একটা গাছের সঙ্গে।'

ঝটকাঝটকি শুরু করল গ্রুটস্কা, দু'হাতে পোশাক জড়িয়ে ধরল, কিন্তু কোনও লাভ হলো না, পড়পড় করে ছিঁড়ে নেয়া হলো তার ব্লাউজ আর স্কার্ট, হিঁচড়ে টেনে নিয়ে বাঁধা হলো একটা তরুণ পাইন গাছের সঙ্গে। লজ্জায় লাল হয়ে গেছে ইরিনা গ্রুটস্কার চেহারা, ফোঁপাচ্ছে অপমানে।

রকোভস্কির নির্দেশে কোমরের চওড়া চামড়ার বেল্টটা খুলল একজন। দ্বিতীয় নির্দেশে সজোরে হাত ঘুরিয়ে চালাল ওটা গ্রুটস্কার বুকে। চড়াৎ করে আওয়াজ হলো। ফর্সা চামড়ায় লম্বা একটা দাগ পড়ে গেল বুকে। লাল।

'মাত্র কি আসছে তার নমুনা দিলাম,' বলল রকোভিচ নিরাবেগ কণ্ঠে। 'কোথায় ও? কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?'

'চলে গেছে ও, এখানে নেই,' ফোঁপানোর ফাঁকে বলল গ্রুটস্কা।

আঙুল তুলে নাড়ল রকোভিচ। আবার নেমে এল চামড়ার বেল্ট। আবার। আবার। স্পষ্টতই অসহায় মেয়েটাকে মারতে মজা পাচ্ছে লোকটা।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। গ্রুটস্কার সাদা চামড়া ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরছে। রকোভিচের নির্দেশে আবার বেল্ট দিয়ে পেটানো শুরু হলো। এখন এক নাগাড়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তচিৎকার করছে ইরিনা গ্রুটস্কা। পেটানো বন্ধ হতেই মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে এল। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর।

'কথা বলার ইচ্ছে জাগছে?' চুল ধরে মাথাটা উঁচু করে শান্ত স্বরে জানতে চাইল রকোভিচ। মেয়ের দিকে তাকাল ইরিনা। বিস্ফারিত চোখে দেখছে বাচ্চা মেয়েটা, দু'গাল বেয়ে নামছে অশ্রুবিন্দু।

'কিছু বলবি না এদের,' চেঁচাল ইরিনা। 'এদের মত লোকরাই তোর বাবাকে খুন করেছিল।'

হঠাৎ করেই ঝটকা দিয়ে হাত ছুটিয়ে নিল বার্থা, সোজা দৌড় দিল বার্ন লক্ষ্য করে।

'যেতে দাও ওটাকে,' রকোভিচের গলা শুনতে পেল ক্রোধান্ধ রানা। 'যা জানার ওর মায়ের কাছ থেকেই জানা যাবে। কই, কি হলো, শুরু করো!'

ইরিনার আর্তনাদ আর বার্থার ফোঁপানির আওয়াজ মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। বার্নের ভেতরে এসে থামল বার্থা, রানার ঠিক নিচেই রয়েছে, দু'হাতে কান চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। কিছু একটা করতে হবে, বুঝতে পারছে রানা, ইচ্ছে হচ্ছে ঝাঁপিয়ে পড়ে অমানুষগুলোর ওপর। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আত্মসমর্পণ করতে পারে। তাহলেও বাঁচবে না মা-মেয়ে। এদিকে কিছুতেই মুখ খুলবে না গ্রুটস্কা আপাত কোমল মহিলার ভেতরে কঠিন

আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা শক্তি কাজ করছে। শীঘ্রি চামড়া কেটে মাংস ছিঁড়তে শুরু করবে বেল্টের চাবুক। সারাজীবনেও ওই দাগ আর মিলিয়ে যাবে না। নিচু গলায় বার্থাকে ডাক দিল রানা, মইয়ের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক বিস্ময় নিয়ে ওপরে তাকাল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, আমি এখানে, বার্থা,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'এখানে চলে এসো, তাড়াতাড়ি!'

মই বেয়ে উঠতে শুরু করল বার্থা, চোখ বিস্ফারিত।

একটা মাত্র উপায় আছে মা-মেয়েকে বাঁচানোর, সেই সঙ্গে নিজেকে। সফল হবার সম্ভাবনা কতটা সেটা নির্ভর করছে বার্থার ওপর। জানালা দিয়ে আরেকবার খাদটা দেখে নিল রানা। দু'পাড় খাড়া ওটার। পাড়ের উচ্চতা দশ ফুটের কম হবে না, আন্দাজ করল রানা, চওড়ায় বড়জোর বিশ ফুট। সোজাসুজি চলে গেছে মাঠের শেষ প্রান্তে, দুশো ফুট দূরে। চওড়া যত কম হয় ততই ভাল।

'আমরা তোমার আম্মুকে বাঁচাব,' বাচ্চা মেয়েটাকে বলল রানা। 'তবে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি যা বলব ঠিক তাই করবে তুমি, ঠিক আছে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল বার্থা, নিষ্পাপ চোখ দুটো রানার ওপর, মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে।

মই বেয়ে নামল ওরা। এক মুহূর্তের জন্যে আর্তচিৎকার থামিয়েছে ইরিনা। আবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হাঁটাহাঁটি করে পায়ের অবস্থাটা বুঝে নিচ্ছে রানা, তীব্র ঘৃণায় গা রী-রী করছে ওর, পায়ের ব্যথাটাকে আর পাত্তা দিচ্ছে না। বার্নের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক দৌড়ে বাড়ির দিকে গেল বার্থা, রানা চড়ে বসল চার মস্ত ব্লেডওয়ালা ট্র্যাক্টরের ড্রাইভিং সীটে।

বেল্টটা আবার ওপরে তুলেছে ইসরায়েলী এজেন্ট, এমন সময় দৌড়াতে দৌড়াতে ওদের কাছে পৌঁছে গেল উত্তেজিত বার্থা। মাকে মারতে উঠেছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'থামুন! থামুন! আমি বলছি লোকটা কোথায় আছে!' আঙুল তুলে খাদটা দেখাল। 'ওটায় আছে। ওখানেই লুকিয়েছে।'

গ্রুটস্কাকে মুখ কালো করতে দেখে বিজয়ীর হাসি হাসল রকোভিচ, হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এল, মাথার ইশারায় সঙ্গীদের আসতে বলে পা বাড়াল সে খাদের দিকে। লাফ দিয়ে পাশ থেকে নামল ওরা খাদের ভেতর। এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল রানা, এবার ট্র্যাক্টর স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে এল ও বার্ন থেকে, সোজা খাদ লক্ষ্য করে ছোটাল ভয়াবহ চেহারার যন্ত্রটা।

খাদের মুখটা ঢালু, তারপরও ধপ করে খাদে নামল ট্র্যাক্টর। কাঁচের ভেতর দিয়ে রানা দেখতে পেল চমকে পেছন ফিরে তাকিয়েছে লোকগুলো। ওর উদ্দেশ্য

বুঝতে দেরি হলো না তাদের। প্রায় পুরো খাদ জুড়ে আসছে ট্র্যাক্টর, সামনে ঘুরছে মস্ত চারটে ক্ষুরধার ব্লেড। ঘুরেই দৌড় দিল তারা। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে চাইছে। গতি বাড়াল রানা। লোকগুলো বুঝে ফেলল গতিতে হার মানাতে পারবে না। দু'পাশে উঁচু পাড়, ওপরে ওঠার উপায় নেই।

থ্যাচ!

প্রথম আওয়াজটা গা গুলানো। সামনের লোকটাকে পেয়ে গেছে ব্লেড, মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

ঘুরে দাঁড়াল রকোভিচ আর তার এজেন্টরা, গুলি করতে শুরু করল। ট্র্যাক্টরের কাঁচ ভেঙে গেল। মাথা নিচু করল রানা। ঠং-ঠং করে ঘুরন্ত ব্লেডে লাগল কয়েকটা গুলি।

থ্যাচ! থ্যাচ! থ্যাচ!

কিরকির করে একটা আওয়াজ হচ্ছে, টুকরো মাংসগুলোকে কিমা করছে ব্লেড।

মারা যাওয়ার আগে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল রকোভিচ, পরমুহূর্তে থ্যাচ করে আওয়াজ হলো, ব্লেডের ভেতর ঢুকে গেল তার দেহ।

আবারও সেই একই আওয়াজ।

শেষ অসুস্থকর আওয়াজটা শুনে তারপর থামল রানা, ট্র্যাক্টরটাকে বারকয়েক আগুপিছু করল, অবশিষ্ট হাড়-মাংস মিশিয়ে দিল মাটিতে, তারপর পিছিয়ে ঢাল বেয়ে উঠে এল খাদ থেকে। লাফ দিয়ে নামল ট্র্যাক্টর থেকে, পায়ের ব্যথা অগ্রাহ্য করে চলে এল গ্রুটস্কার কাছে, মায়ের বাঁধন খুলে ফেলেছে বার্থা, গায়ের শার্ট দিয়ে রানা ঢেকে দিল মহিলাকে। দু'জন ওরা, বার্থা আর রানা, ধরে ধরে আহত গ্রুটস্কাকে নিয়ে ঢুকল ফার্ম হাউসে, বিছানায় শুইয়ে দিল। এখনও কাঁপছে ইরিনার দেহ, থেকে থেকে ফুঁপিয়ে উঠছে ব্যথায়, চোখে আতঙ্কিত দৃষ্টি।

'আর চিন্তা নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'ওরা আর জ্বালাতে আসবে না। তবে আগামী কয়েকদিন খাদের ধারেকাছে যাবে না তোমরা।' আর কিছু বলল না ও।

ইরিনার চোখ দুটো বন্ধ, আস্তে করে রানার হাতটা ধরল, ধরে থাকল অনেকক্ষণ। মহিলা একটু সুস্থির হওয়ার পর তোয়ালে আর গরম পানির ব্যবস্থা করল রানা, গ্রুটস্কার শরীর মুছিয়ে দিল যত্নের সঙ্গে। বলল, 'এবার আমার নার্সিঙের পালা।' সেদিন বার্থা আর রানা মিলে রান্না করল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রানা জিজ্ঞেস করল ট্রেইন থেকে ও যেটাতে লাফ দিয়েছিল সেটা ছাড়া ধারেকাছে আর কোনও লেক আছে কিনা। গ্রুটস্কা জানাল নদী আছে একটা, দশ মাইল উত্তরে।

মাঝরাতের পর ফোক্সওয়্যাগেন প্যানেল ট্রাকটা নিয়ে খাদের ভেতর নামল রানা, একটা কম্বল আর কোদাল ব্যবহার করে দেহাবশিষ্টগুলো কেচে তুলল মাটি থেকে। কাজটা করতে গিয়ে হেডলাইটের আলোয় দৃশ্যটা দেখে বমি চলে এল ওর। মোসাদের কিমা ট্রাকে তুলে নদীতে ফেলে দিয়ে এল ও, ফিরে এল রাত দুটোয়।

অবাক হতে হলো ওকে। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে ইরিনা গ্রুটস্কা, বিছানায় বসে আছে, ওর ফেরার অপেক্ষা করছে। ইরিনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কিচেনে চলে এল ও, কাবার্ড থেকে ব্র্যান্ডি বের করে দু'পেগ পরিমাণ গলায় ঢালল। এতক্ষণে মনে হলো নাকের ভেতর থেকে রক্তাক্ত লাশের আঁশটে গন্ধটা গেল।

ও ফিরে আসতে ইরিনা বলল, 'রানা, জানি তুমি দু'একদিন পর চলে যাবে। একটা অনুরোধ করব, রাখবে? শোবে আমার পাশে? তোমার কাছে আর কিছুই আমি চাই না। শুধু একটু সঙ্গ। দেবে না?'

ঘুমন্ত বার্থাকে একবার দেখে এলো রানা, তারপর ঢুকল ওর মায়ের ঘরে। অপেক্ষা করছে ইরিনা। মহিলার মাথাটা বুকে নিয়ে শুয়ে পড়ল ও পাশে। একটু পরই ওকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা একটা মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়ল ইরিনা, ভারী হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। এক সময় রানার চোখেও নামল ঘুম।

মাঝ সকালে ওদের ঘুম ভাঙল। কৃতজ্ঞ চোখে রানার দিকে চাইল ইরিনা, কোনও আপত্তি শুনল না, একটু পরই ব্যস্ত হয়ে গেল ব্রেকফাস্ট তৈরির কাজে।

সেই রাতে বিদায় নিল রানা, কথা দিল আবার ফিরে আসবে কখনও। ওকে কাছের একটা শহরে পৌঁছে দিল গ্রুটস্কা। সেখান থেকে জুরিখের একটা মিল্ক ট্রেইন ধরল রানা, এখন ও জানে কাকে খুঁজে বের করতে হবে, কেন এবং কে দায়ী।

কার্ল ক্রিস এখনও বহাল তবিয়তে আছে, ভাবছে সে নিরাপদ। নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। লোকটার ভুল ধারণা ভাঙবে।

নয়

জুরিখ।

রাত নেমেছে। আকাশে জ্বলজ্বল করছে হাজারো নক্ষত্র। রানা তৈরি। ফোন নাম্বার দেখে টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে কার্ল ক্রিসের বাড়ির ঠিকানা বের করে নিয়েছে ও, ঠিক করেছে আজ রাতে ওখানে যাবে।

হোটেল হিলটন থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল রানা, রাত আটটা। উচ্চ-মধ্যবিত্তদের একটা এলাকায় সুন্দর একটা বাড়িতে থাকে কার্ল ক্রিস। আগের ব্লকের কাছে ট্যাক্সিটা ছেড়ে বাকি পথ হেঁটে এল রানা। আরেকটু হলেই কার্ল ক্রিসের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল ওর, লোকটা বাইরে কোথায় যেন যাচ্ছে। চট একটা গাছের আড়ালে সরে গেল রানা, ওকে ক্রিস দেখতে পায়নি।

গটগট করে হেঁটে দূরে চলে গেল সুঠামদেহী লোকটা। ভাল পোশাক পরে আছে, পশ কোনও রেস্তোরাঁয় ডিনার সারতে যাচ্ছে হয়তো, আবার এমনও হতে পারে যে রাতটা সে বাইরে কোনও বান্ধবীর বাসায় কাটাবে। দূর দিয়ে বাড়িটা একপাক ঘুরে এল রানা। একটা জানালাতেও আলো জ্বলছে না। জানালাগুলো নিচুতে, ঢোকার জন্যে যেন ডাকছে কাছে। পেছনের একটা জানালার ওপর হামলে পড়ল রানা

সাধারণ ছিটকিনি দিয়ে আটকানো। জানালাটা খুলতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না ওর। ওপরে উঠে গেল শার্সি। সাবধানে নজর বোলাল রানা। ইলেকট্রিকাল একটা অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। ওটা অফ করে পনেরো সেকেন্ড পর ঘরের ভেতরে পা রাখল রানা, জানালাটা বন্ধ করে দিল পেছনে।

সৌখিন লোক কার্ল ক্রিস, প্রতিটা ঘরে জ্বলছে নীল ডিম-লাইট। রানার সুবিধে হলো। আলো বেশি নয়, তবে সার্চ করার জন্যে যথেষ্ট। লিভিং রুম, কিচেন আর বেড রুমে অস্বাভাবিক কিছুই পেল না বানা। লিভিং রুমের একটা দরজা দিয়ে স্টাডিতে যাওয়া যায়। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিল জানালার, তারপর একটা ল্যাম্প জ্বালল ডেস্কের ওপর আইএসএসের কাগজপত্র ছাড়া আর তেমন কিছু নেই।

ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এল রানা। ওখানে একটা দরজা আছে সিঁড়ির সামনে। সিঁড়িটা নিচের বেসমেন্টের দিকে নেমে গেছে। সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দেয়ালের গায়ে একটা বড় সুইচ, ওটা অন করল রানা।

আলোয় ভেসে গেল বিশাল চৌকোনা ঘরটা। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে চল্লিশ ফুট বাই তিরিশ ফুট হবে। দেয়ালে সাউন্ডপ্রুফ ওয়ালবোর্ড। ঘরের মাঝখানে একটা ল্যাব টেবিল। ওটার ওপর এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য টেস্ট টিউব আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। রানার নজর কাড়ল আংশিক খোলা একটা ছোট পিস্তল। ওটার পাশেই পড়ে আছে কিসের যেন ব্লু-প্রিন্ট। পিস্তলটা হাই পাওয়ার কমপ্রেস্‌ড্‌ এয়ার-পিস্তল, আগেও এধরনের জিনিস দেখেছে ও। ইদানীং হাইপডারমিক সিরিঞ্জের বদলে ডাক্তাররা এগুলো ব্যবহার করছেন ইঞ্জেকশনের ব্যথা কমাতে। চামড়ার কাছে পিস্তল ধরে ফায়ার করা হয়, রোমকূপ দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ভেতরে ঢুকে যায় তরল, রোগী প্রায় কিছুই টের পায় না সামান্য চুলকানি ছাড়া।

টেবিলে যেটা পড়ে আছে সেটা দিয়ে বিষ অথবা ভাইরাস–যেকোন কিছুই চামড়ার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব। যার ভেতরে ঢুকছে সে প্রায় কিছুই টের পাবে না। ব্লু-প্রিন্টে মনোযোগ দিল রানা। আরও ছোট এবং শক্তিশালী পিস্তলের মডেল কাগজে আঁকা আছে।

ছোট একটা বোতল ওর নজর কাড়ল। কাগজের লেবেল ওটার গায়ে। হাতে তুলে নিল রানা। পড়ল। ভাইরাস এস ২৬-এর অ্যান্টিডোট।

হঠাৎ করেই ঘাড়ের কাছের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল ওর, মনে হলো কেউ ওকে দেখছে। সতর্ক হয়ে উঠল রানা। কেউ না কেউ আছে ঘরে ও ছাড়াও। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কার্ল ক্রিস, হাতে কুৎসিত দর্শন একটা নাকবোঁচা রিভলভার।

মোজা পরে আছে লোকটা, জুতো নেই। এত নিঃশব্দে সেজন্যেই আসতে পেরেছে।

'বলতেই হয় আমি অবাক হয়েছি,' বলল কার্ল ক্রিস। 'মাসুদ রানা। আমার ঘরে? স্বাগতম!' মুচকি মুচকি হাসছে লোকটা, কিন্তু চোখ দুটোয় পাথরের মত শীতল দৃষ্টি। 'শত্রু হিসেবে তোমাকে আমি যথেষ্ট দাম দিই, রানা। তবে আমার সমকক্ষ মনে করি না। আমার সমকক্ষ হলে এতদিনে বিসিআইয়ের চীফ হয়ে যেতে তুমি।' আস্তে আস্তে সামনে বাড়ছে। 'আমার ক্যারিয়ার শেষ করে দিয়েছ তুমি, রানা। আমার দুর্ভাগ্য যে মোসাদের ইউরোপিয়ান সেকশনের সমস্ত ফিল্ড এজেন্ট তোমার হাতে মারা গেছে। তবে ক্ষতিটা আমি পুষিয়ে নেব ঠিক করেছি।'

'টের পেলে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার বোকামিতে,' বলল ক্রিস। 'তুমি ঢুকতেই জানতে পেরেছি। প্রতিটা দরজা-জানালায় একটা করে ইলেকট্রিকাল আই বসিয়ে রেখেছি আমি। ওগুলো একটা সিগন্যাল পাঠায় একটা রিসিভিং সেটে। আমার পকেটে ছোট্ট একটা বাযার বেজে ওঠে। তবে আমি জানতাম না তুমি আসবে।...কাজের কথায় আসি,

কিভাবে মরতে চাও, রানা? বলেছি তোমাকে আমি বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে করি। এক গুলিতে তোমাকে শেষ করে দিলে সারাজীবনেও আমার আফসোস যাবে না।'

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে ব্লু-প্রিন্টটা দেখল সে। 'ওটা আমার নতুন ক্যালকুলেশন। জিনিসটা ম্যাচের একটা বাক্সের চেয়ে বড় হবে না।' বাম হাত পকেটে ঢুকিয়ে বের করে আনল। 'দেখতে চাও? এই যে দেখো, তৈরি করেছি একটা।' তালুতে রাখা চৌকোনা ছোট্ট বাক্সটা দেখাল সে।

চট করে মনে পড়ল রানার, শেষদিন সৈকতে প্রফেসরের কাঁধ চাপড়ে দিয়েছিল কার্ল ক্রিস। ছোট পিস্তল ব্যবহার করেছিল বলেই অতটা কাছে যেতে হয়েছিল তাকে। 'প্রফেসর ইব্রাহিমকে সৈকতে ইঞ্জেক্ট করো তুমি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক ধরেছ,' মুহূর্তের জন্যে চোখ সরু হলো ক্রিসের, রানার চোখে তাকিয়ে আছে, যেন ভেতরটা পড়ছে। 'তবে তোমার ধারণা ঠিক নয়, রানা, ইচ্ছে করলে আমি দূর থেকেও তাকে ইঞ্জেক্ট করতে পারতাম।' আবার ম্যাচ বাক্সটা দেখাল সে। 'এটার রেঞ্জ দশ মিটার।'

'এটা অ্যান্টিডোট?' হাতের বোতলটা দেখাল রানা।

'হ্যাঁ,' হাসল ক্রিস। 'কিন্তু তোমার কোনও কাজে আসবে না। ওটা তৈরি করতেই হলো। হাজার হলেও এক্সপেরিমেন্টের সময় আমার নিজেরও কোনও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে দুর্ঘটনাবশত।'

'ক্ষতিগ্রস্ত বিজ্ঞানীদের সুস্থ করে তোলা যায় এটা দিয়ে?'

'যায়, যদি ভাইরাস প্রয়োগের একবছরের মধ্যে অ্যান্টিডোট দেয়া যায়। বললে বিশ্বাস করবে না শতকরা নিরানব্বুই দশমিক নয়-নয় ভাগ সুস্থতা ফিরে আসে।' হাসল ক্রিস। 'আমার আবিষ্কার জিনিসটা। পিস্তলটাও। পিস্তলের প্রয়োগটা তোমাকে দেখাব আমি। কিন্তু দুঃখিত, অ্যান্টিডোটের প্রয়োগ দেখতে পাবে না তুমি এ-জীবনে।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা, সময় চাইছে। 'শুধু মুসলিম বিজ্ঞানীদের কেন?'

'কারণ মুসলিমরা চাকরের জাত। চাকর হয়েই থাকতে হবে ওদের। তোমাদের আমরা পাঁচশো সত্তর সালে ফেরত পাঠাব। প্রথমে আমার পরিকল্পনা নিয়ে দ্বিধায় ছিল মোসাদ, কিন্তু টুইন টাওয়ার আক্রমণের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মুসলমানদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হবে।'

'সিআইএ-ও জড়িত? ওরা জানে সব?'

'মোসাদের এজেন্ট যারা, যারা সিআইএ-র ডবল এজেন্ট, তারা জানে। করো, রানা, আরও কোনও প্রশ্ন থাকলে করো। আমি চাই না মনে কোনও প্রশ্ন

নিয়ে ভেজিটেবল হও তুমি।'

'জিনিসটা কি, ক্রিস, যেটা ব্রেইনের অমন ক্ষতি করে?'

'একটা ভাইরাস। বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা ফাংগাস তৈরি করে যেটা ব্রেইন টিস্যুকে আক্রমণ করে, ব্রেইন সেলের অক্সিজেন সাপ্লাই প্রায় বন্ধ করে দেয়।'

কথার ফাঁকে আস্তে আস্তে সামনে বাড়ছে ক্রিস, রানাকে মিস করতে রাজি নয়।

'আমি তোমাকে বাঁচার একটা সুযোগ দেব, রানা। তবে সেই বাঁচা হবে মৃত্যুর চেয়েও করুণ। বাকি জীবন অথর্ব হয়ে থাকতে হবে তোমাকে। অন্যের গলগ্রহ হয়ে বাঁচতে হবে।'

মাথার ওপর হাত তুলল রানা, মুহূর্তে হাতের ঝাঁকিতে ছোরাটা চলে এল ওর হাতের মুঠোয়, পরক্ষণেই থ্রো করল ও। শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ক্রিস। ঘ্যাচ করে তার ডান হাতের কব্জিতে বিঁধল ছোরাটা। হাত থেকে রিভলভারটা পড়ে গেল। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল কার্ল ক্রিস, এক হাতে চেপে ধরল আরেক হাত। ম্যাচ বক্সটাও হাত থেকে পড়ে গেছে। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল রানা, ঝাঁপ দিল ক্রিসের রিভলভার লক্ষ্য করে। শেষ মুহূর্তে শরীর গড়িয়ে সরে যেতে হলো ওকে। প্রথম লাথিতে রিভলভারটা টেবিলের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছে ক্রিস, দ্বিতীয়বার পা তুলেছে রানার মুখে লাথি মারার জন্যে।

গড়ান দিয়ে সরে গিয়েই উঠে দাঁড়াল রানা, ক্রিস উবু হয়ে ম্যাচ বক্স তুলছে, লাথি মারল তার পেট লক্ষ্য করে।

লাগল না লাথিটা।

পিছিয়ে গেছে ক্রিস, ঘুরেই দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে, একেক লাফে চারটে করে ধাপ টপকাচ্ছে।

ধাওয়া করল রানা, কিন্তু ধরতে পারল না। ও সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছোতেই বন্ধ হয়ে গেল ওপরের দরজাটা ক্লিক করে আওয়াজ হলো। তালা আটকে দেয়া হয়েছে। ভারী ওক কাঠের পুরু দরজা, খালি হাতে ভাঙার প্রশ্নই ওঠে না।

রিভলভার দিয়ে তালা উড়িয়ে বের হতে হবে।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। কার্ল ক্রিসের মুক্তি নেই। ল্যাবে নেমে এল ও, শুনতে পেল হিসহিস আওয়াজ। সাদা গ্যাস ঢুকছে দেয়ালের লুকোনো ফুটো দিয়ে। শ্বাস নিতে কষ্ট হলো ওর। দম আটকে উবু হয়ে রিভলভারটা টেবিলের তলা থেকে বের করল রানা, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সিঁড়ির ধাপ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারল না, তার আগেই দম শেষ হয়ে

গেল। দম নিল ও, মাথার ভেতর জ্বলে উঠল রঙচঙে শত শত বাতি।

আর কিছু ওর মনে নেই।

দশ

গ্যাসের প্রভাব দূর হয়ে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে অনবরত পানি ঝরছে রানার, কাজেই ধারণা নেই কোথায় আছে। তবে ঠাণ্ডা। অসহ্য ঠাণ্ডা। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে। শিউরে শিউরে উঠছে শরীর। হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছল রানা। চোখের সামনে শুধু কালো আর সাদা পর্দা। তারপর আস্তে আস্তে পরিষ্কার হলো দৃষ্টি। হু-হু বাতাস বইছে। অনেক ওপরে আছে ও। ক্রমেই উঠছে আরও ওপরে। নিচের দিকে তাকাল। আবছা অন্ধকার আর ধূসর তুষার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। স্কি করার ঢালের ওপর দিয়ে যাচ্ছে ও একটা চেয়ার লিফটে চড়ে। বাম দিকে তাকাল রানা, ফুট পঞ্চাশেক নিচে দেখতে পেল কার্ল ক্রিসকে. কেব্‌ল্ অপারেটিং মেকানিজমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে একটা অন্ধকার স্কি সাপ্লাই কেবিন। লোকটার গলা শুনতে পেল ওপর থেকে।

'কপাল ভাল তোমার, রানা, আমার এয়ারপিস্তলটা আছাড় খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, নইলে তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতাম। এখন স্কিইং অথরিটিকে ঘোষণা করতে হবে যে বোকা এক স্কিয়ার ট্রেসপাসিং করতে গিয়ে মারা পড়েছে। চকিতে মরবে তুমি, রানা, সত্যিই তুমি ভাগ্যবান।'

দ্রুত ওপরে উঠছে চেয়ার লিফট, ছোট হয়ে যাচ্ছে কার্ল ক্রিসের দেহ। চাঁদের আলোয় তার হাতে একটা কুঠার দেখতে পেল রানা। বুঝতে দেরি হলো না ওকে ওপরে তুলে কেব্‌ল্ কেটে দেবে লোকটা। অনেক নিচে আর দূরে জুরিখের আলো মিটমিট করতে দেখল রানা। শহরের বাইরের উঁচু একটা পাহাড়ে ওকে নিয়ে এসেছে লোকটা, চেয়ার লিফটে উঠিয়ে মেশিন চালু করে ওপরে তুলছে। জ্ঞান না ফিরলে ও জানতেও পারত না কখন কিভাবে মারা গেল। বুঝতে পারল না ক্রিস দেরি করছে কেন, যথেষ্ট ওপরে ওকে তোলা হয়ে গেছে।

আরও ওপরে উঠছে লিফট। মাথা ওপরে তুলে কেব্‌ল্‌টা দেখল রানা। ওটা ছিঁড়ে গেলে চেয়ার সমেত নিচে খসে পড়বে ও। তবে কেব্‌ল্‌টার পুরুত্ব

দেখে বোঝা যায় ঢিলেঢালা ভাবে খসে পড়বে ওটা। তবে ওর যদি ভুল না হয় তাহলে পতনের আগে মুহূর্তের জন্যে কেব্‌ল্‌টা চেয়ার সহ থমকে দাঁড়াবে।

সাবধানে উঁচু হলো রানা, উঠে দাঁড়াচ্ছে স্ট্র্যাপে পা বাধিয়ে। দুলে উঠল চেয়ারটা।

পটাং করে একটা আওয়াজ শুনতে পেল, পরমুহূর্তেই ঢিল পড়ল কেব্‌লে। তারটা কেটে দিয়েছে কার্ল ক্রিস!

লাফ দিল রানা, হাত দুটো ওপরের দিকে। কেব্‌ল্‌টা ধরে ফেলল। নিচু হয়ে যাচ্ছে কেব্‌ল্‌, সেই সঙ্গে সামনের পাহাড়ের দিকে চলেছে। বাতাস কেটে সামনে আর নিচে ছুটছে রানার দেহ। ভোঁতা একটা আওয়াজ শুনতে পেল। চেয়ারটা বরফের ওপর আছড়ে পড়েছে।

হাতের তালু জ্বলছে রানার, মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে। তারটা দুলে দুলে নামছে, দু'পা দিয়ে নিচের কেব্‌ল্‌ জড়িয়ে ধরল ও, নিজেকে রানার মনে হচ্ছে মস্ত একটা পেন্ডুলামের শেষ প্রান্ত। কার্ল ক্রিস এখন অনেক দূরে, তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সম্পূর্ণ মনোযোগ নিচের দিকে দিল রানা। আর বিশ ফিট বড়ো জোর, তারপরই কেব্‌ল্‌ আর ও শক্ত বরফের ভেতর ঢুকে যাবে চিরতরে। কেব্‌লের ওজনই ওর কাল হবে, যদি গতি আর পতনে মৃত্যু না হয়।

দশ ফুট ওপরে থাকতে হাতটা ছেড়ে দিল রানা, ধপ করে খসে পড়ল নিচে। কপাল ভাল নিচের বরফ জমাট নয়, পুরু তুষারে পড়েছে ও। গলা পর্যন্ত ঢুকে গেল ভেতরে। ব্যথা লাগেনি বললেই চলে, তবে আহত পা-টা শরীর থেকে খুলে গেছে মনে হলো। ওর ফুট দশেক সামনে পড়ল কেব্‌ল্‌টা, ওজনের কারণে পড়েই তুষারের তলায় হারিয়ে গেল।

দাঁতে-দাঁত খটাখট বাড়ি খাওয়া শুরু করেছে ঠাণ্ডায়, জানে না ও পাহাড়ের ঠিক কোথায় আছে এখন। তুষার সরিয়ে উঠে এল ও, নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে, ভাবছে কোথাও না কোথাও ঢাল শেষ হবে।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। বরফে পিছলে প্রচুর আলো ছড়াচ্ছে। দশ মিনিটও পার হয়নি, রানার মনে হলো পা দুটো জমে যাচ্ছে ওর। ক্লান্ত ও, হতাশ লাগছে, মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কার্ল ক্রিসই জিতে গেল। শীতের উপযুক্ত কাপড় থাকলেও তুষারে জমে মৃত্যু হতে পারে মানুষের, আর ওর পরনে সাধারণ পোশাক। পায়ে চাপড় মারল রানা, বুঝতে পারল দ্রুত অনুভূতি হারাচ্ছে ওগুলো। এখন আর হাঁটছে না ও, পা টেনে টেনে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ করেই সামনে একটা কালো আকৃতি দেখতে পেল। চৌকো কালো আকৃতি। কাছে যেতে বোঝা গেল ছোট একটা কেবিন, স্কিয়ারদের বিশ্রাম নেবার জন্যে।

খুবই ছোট কেবিন। ভেতরে ফায়ার প্লেস নেই তবে তীক্ষ্ণ দাঁত বসানো হিমেল হাওয়া আর তুষারের কবল থেকে বাঁচা যাচ্ছে। একদিকের দেয়ালে চার জোড়া স্কি দেখতে পেল ও। রিপ্লেসমেন্ট। কোনও স্কিয়ারের স্কি ভেঙে গেলে বা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেলে এখান থেকে বদলে নিতে পারবে।

ব্যস্ত হাতে এক জোড়া স্কি তুলে নিল রানা, মনে হলো নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। ঢালের শেষ মাথায় পৌঁছে শহরের ধারেকাছে যেতে হলে স্কিগুলো অনেক সাহায্যে আসবে। চাপড় মেরে-মেরে পায়ের সাড় ফিরিয়ে আনল রানা, স্নো শ্যু নেই, জুতোর সঙ্গে যতটা ভাল ভাবে সম্ভব বাঁধল স্কি, তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। সাবধানে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। উপযুক্ত জুতো না থাকার কারণে বাঁক নিতে গেলে সতর্ক থাকতে হচ্ছে, নইলে স্কি ছুটে যাবে জুতো থেকে। ওর কাছে স্কি পোল নেই, কাজেই গতি বড় ধীর। স্কিইং করায় গায়ে কামড় বসাচ্ছে বাতাস, মনে হচ্ছে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারছে কেউ। তবে বুঝতে পারছে রানা, ঢালের শেষ মাথা পর্যন্ত ঠিকই টিকে থাকতে পারবে ও। পারতে হবে।

বাতাসের ফিসফিসানি ছাপিয়ে চাপা হিসহিস আওয়াজটা ঠিক পেছন থেকে আসছে। দ্রুত আসছে। দূর থেকে কাছে চলে আসছে। ঘাড় ফেরাল রানা, দেখল পেছনে দ্রুত এগিয়ে আসছে একজন স্কিয়ার। যেই বাঁক নিচ্ছে, নরম তুষারে ঘষা লেগে হিসহিস আওয়াজ করছে তার স্কি। দৈহিক আকৃতিটা চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। কার্ল ক্রিস আসছে তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে।

লোকটার কাজে কোনও খুঁত নেই। ও মারা গেছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিল নিশ্চয়ই, শুধু চেয়ারটা দেখে বুঝেছে বেঁচে আছে ও, তারপর তাড়া করেছে। গতি বাড়াল রানা। যদিও বুঝতে পারছে গতিতে হারাতে পারবে না ও ক্রিসকে। স্কি পোলের খোঁচায় দ্রুত ছুটে আসছে লোকটা। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। বিশ ফিট…দশ ফিট…পাঁচ ফিট। একটা চোখা স্কি পোল বর্শার মত উঁচু করল ক্রিস, গেঁথে ফেলবে রানাকে।

দ্রুত বাঁক নিল রানা স্কি যাতে জুতো থেকে ছুটে না যায় সেদিকে লক্ষ রেখে। ছুটে গেলেই সর্বনাশ। হিমশিম খাচ্ছে রানা। ফুট খানেক দূর দিয়ে পাশ কাটাল কার্ল ক্রিসের স্কি পোল।

ঢালের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ওরা প্রায়। গাছের ঘনত্ব এখানে আগের চেয়ে বেশি। লোকটাকে গাছের আড়ালে চলে যেতে দেখল রানা। আধ মিনিট পরেই আবার সে উদয় হলো পেছনে। এবার পাশ থেকে আসছে। শেষ মুহূর্তে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা। রানার কোটের কাঁধে ঘ্যাচ করে ঢুকল ছোরার মত তীক্ষ্ণ স্কি পোল। ঝটকা দিয়ে কোট ছুটিয়ে নিল ও, সোজা ছুটল নিচের দিকে। একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে আবার ছুটে এল ক্রিস, স্কি পোল সামনে বাড়িয়ে

রেখেছে। লোকটা কাছে চলে আসতে এবার সরল না রানা, মাথা নিচু করে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে বসল ক্রিসের পেটে। ওর মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল স্কি পোল। ধাক্কা খেয়ে দু'জনই পেছনে ছিটকে পড়েছে। স্কি খুলে গেছে রানার জুতো থেকে।

প্রায় একই সঙ্গে বরফ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দু'জন। স্কি পোলটা দিয়ে লাঠির মত ঘুরিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করল ক্রিস, ঢালের ওপরে আছে সে। রানা দেখল ওর ছোরার ঘায়ে আহত কব্জিতে ব্যান্ডেজ বেঁধে রেখেছে লোকটা। রানার চোয়ালে আছড়ে পড়ল ক্রিসের স্কি পোল। বিশেষ ব্যথা লাগল না অবশ চোয়ালে, কিন্তু চিৎ হয়ে পেছনে পড়ে গেল ও।

ভারী স্কি বুট দিয়ে রানার মাথায় লাথি মারল ক্রিস। ক্রিসের গোড়ালি আঁকড়ে ধরল রানা, মোচড় মারল গায়ের জোরে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল কার্ল ক্রিস, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল বরফে। ওঠার আগেই রানার একটা ডান হাতি ঘুসি খেল চোয়ালে। ঘুসি মারতে গিয়ে পা পিছলে রানাও পড়ে গেল উপুড় হয়ে। পালাচ্ছে ক্রিস। লাফ দিয়ে উঠে ধাওয়া করল রানা, ডান হাতি আরেকটা ঘুসি বসিয়ে দিল কার্ল ক্রিসের চোয়ালে। পরমুহূর্তে লাফিয়ে পিছিয়ে আসতে হলো ওকে। পায়ের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠেছে বরফ। আরেক লাফে আরও তিন হাত পেছনে সরল ও কড় কড় করে একটা কানফাটা আওয়াজ হলো। চোখের সামনে দৃশ্যটা ঘটছে, অথচ বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। বরফে লম্বা একটা ফাটল দেখা দিয়েছে। ওর মাত্র দু'ফিট সামনে পাহাড়ের গায়ে গভীর একটা খাদ দেখা দিল। গড়িয়ে খাদের ভেতর পড়ে যাচ্ছে কার্ল ক্রিস, শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ভয়ার্ত চিৎকার ছাড়ল ক্রিস, মনে হলো কুকুর কাঁদছে। ঢালের ওপর থেকে হড়হড় করে নেমে এলো কয়েক টন তুষার ও বরফ, খাদটা ঢেকে দিল দেখতে দেখতে। চিৎকারটা মাঝপথে থেমে গেল। রানাও বুক পর্যন্ত চাপা পড়ল খসে পড়া তুষারে।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে এল ও, কার্ল ক্রিসের অবস্থা বোঝার জন্যে কাছে যাওয়ার সাহস হলো না। থাকুক লোকটা খাদের ভেতর টনকে-টন বরফ চাপা পড়ে, আগামী গ্রীষ্মে তার অবিকৃত লাশটা পাবে পাহাড়ে পিকনিক করতে আসা ফুর্তিবাজ দম্পতিরা।

স্কি পরে নিয়ে ধীর গতিতে রওনা হয়ে গেল ও ঢালের নিচের অংশের দিকে। আর বেশি দূরে নেই ঢালের শেষ।

এখনও অনেক কাজ বাকি। মোসাদ এত সহজে হার মানবে না, পাল্টা ছোবল দিতে চাইবে তার আগেই উদ্ধার করতে হবে অ্যান্টিডোট, ধ্বংস করতে হবে ক্রিসের ল্যাবরেটরি, তারপর পুরো রিপোর্ট পাঠাতে হবে মেজর

জেনারেলকে। সম্ভবত গা ঢাকা দিতে বলবেন তিনি। সেক্ষেত্রে, ঠিক করে ফেলল রানা, ডক্টর ইব্রাহীম আর অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সুস্থ করে তোলার পর সোজা ইতালির ক্যালিব্রিয়াতে যাবে ও। ওর কাছে কিছু কৈফিয়ত পাওনা আছে অ্যাঞ্জেলিয়া আর তার ভাই-বেরাদারের। ওদের বোঝাতে পারলে পাহাড়ে ছুটিটা আনন্দে কাটবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

***

মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

মোসাদ চক্রান্ত

'কারণ, মুসলিমরা চাকরের জাত। চাকর হয়েই থাকতে হবে ওদের। তোমাদের আমরা পাঁচশ সত্তর সালে ফেরত পাঠাব।'
কথাটা কেমন লাগছে আপনার শুনতে?
মাসুদ রানারও ভাল লাগেনি।
ও ভাবতেও পারেনি জড়িয়ে পড়বে মোসাদের চক্রান্তে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০